সমৃদ্ধ সংস্করণ

হাদীস ও ইতিহাসের গল্পপাঠ

সকালের মিষ্টি রোদ



শরীফ মুহাম্মদ

হাদীস ও ইতিহাসের গল্পপাঠ

সকালের মিষ্টি রোদ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

হাদীস ও ইতিহাসের গল্পপাঠ

সকালের মিষ্টি রোদ

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

নির্বাহী সম্পাদক. মাসিক আল কাউসার

বিভাগীয় সম্পাদক. দৈনিক আমার দেশ

মাকতাবাতুল আযহার

প্রথম আযহার সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৫
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ইমেইল : maktabatulazhar@yahoo.com

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
✆ : 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ 017 15 02 31 18

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী. কালার ক্রিয়েশন
অলঙ্করণ : আবদুর রহমান
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, mdfaruque81@gmail.com

ISBN : 435-968-19890-7-3

মূল্য ১২০ টাকা

SHOKALER MISTI ROD By **Sharif Muhammad**
Published by Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh

MRP : Taka. 120 US $ 10

অ র্প ণ

ভাষাসৈনিক

অধ্যাপক আবদুল গফুর

মনীষা ও মমতার আধার।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উভয় জাহানে

শান্তি দান করুন।

মিষ্টি রোদের জন্য

গল্পের মধ্যে হাদীস শরীফের কিছু শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। এটিই এ বইয়ের মূলপাঠ। চৌদ্দ বছর আগে প্রথম প্রকাশ হয়েছিলো। ছোটদের জন্য ছোট বই। তখন প্রকাশিত একই রকম আরেকটি ছোট বইয়ের নাম– আলোর মুখের ছবি। একটি কিশোর-আরবি রচনা অবলম্বনে ওই বইটি তৈরি। সেটির বিষয়বস্তু হচ্ছে, এক নজরে হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাস।

বর্তমান সংস্করণে এই ছোট দু'টি বইকে একসঙ্গে করা হলো। অবশ্য সকালের মিষ্টি রোদে একটি বৃষ্টির গল্প এবার বেড়েছে। সংগে যোগ হয়েছে সামান্য ঠিকঠাক গোছগাছ। এরপর বইটি পাঠকদের সামনে এসেছে নতুন আঙ্গিকে। ছোট্ট বন্ধুদের ভালো লাগলেই আমরা খুশি। আমরা ভালোভাবে চলি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার প্রতি খুশি হয়ে যান। আমীন।

শরীফ মুহাম্মদ
১ জুলাই ২০১৫
পল্লবী, ঢাকা

সূ চি প ত্র

সুখের বারান্দা / ১৩
মানুষের সেতু / ১৯
স্বচ্ছ আলোর মুখ / ২৫
তাদের জন্য কাজ / ৩১
বিষের স্বাদ / ৩৭
ছোঁয়া / ৪৩
অবাক স্বীকারোক্তি / ৪৯
বৃষ্টিভেজা বিকেল / ৫২
সকালের মিষ্টি রোদ / ৫৮
আলোর মুখের ছবি / ৬৫

সকালের মিষ্টি রোদ

গল্পে হাদীসের পাঠ

সুখের বারান্দা

রাস্তায় আজ এতো কাদা!

সালমানের হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতাটা নিয়েই মুশকিল। কখন ছিঁড়ে যায়, ঠিক নেই। এর আগে দু'বার বদলানো হয়েছে ফিতা। গতরাতে হঠাৎ করেই বৃষ্টি হয়ে রাস্তা-ঘাট একদম চপ্‌চপা করে দিয়েছে। আগে জানলে টায়ারের টুকরো দিয়ে বানানো 'লাইফ গ্যারান্টি' স্যান্ডেল নিয়েই বাড়ি থেকে বের হতো।

ক্লাস আরম্ভ হতে বেশি বাকি নেই। গতকাল যারা দেরিতে স্কুলে এসেছিলো, সবাইকে খোলামাঠে নীল ডাউন করতে হয়েছে। হেডস্যার বলে দিয়েছেন : এরপর যদি কেউ দেরিতে স্কুলে আসে তাকে মাঠ জুড়ে ডিগবাজি দিতে হবে। হেডস্যারের কথা মানেই খোলামাঠে কোর্ট-কাচারি। হেডস্যারকে ভয় না পাওয়া স্কুলের মাঠে বাসা বাঁধা পিঁপড়েদের পক্ষেও যেন সম্ভব নয়। সেই হেডস্যারই আবার পাঁচদিন ধরে সালমানদের প্রথম ক্লাসটি নিচ্ছেন।

আজ সম্ভবত আর রক্ষা নেই। সালমানের মনটাই খারাপ হয়ে গেলো। কোনোদিন দেরি হয় না তার। যেদিন সবচেয়ে বেশি কড়াকড়ি স্কুলে, সেদিনই ধরা পড়তে হচ্ছে তাকে। শাস্তির চেয়েও বড় ব্যাপার হয়ে গেলো এখন ইজ্জতের প্রশ্ন। রুবেল, শাহীন আর

কালামরা তো অনেক দিন ধরেই তার ওপর বিরক্ত। ক্লাসের নিরীহ ফাস্টবয় হওয়ার 'অপরাধেও' তার ওপর তাদের রাগের শেষ নেই। সবার শাস্তি হলেও স্কুলে দেরিতে আসা নিয়ে এ পর্যন্ত সালমানকে কখনো বেকায়দায় পড়তে হয়নি। অথচ আজ তাকে বাগে পেয়ে যাবে সবাই। কোনো কারণে হেডস্যার সালমানের দিকে খেয়াল না করলেও রুবেল, শাহীন, কালামরাই তাকে ধরিয়ে দেবে।

স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সালমান দেখলো, কোনো রুমের সামনেই কোনো ছাত্র নেই। সবাই ভেতরে বসে আছে। স্যাররা যার যার ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েছেন। সালমানের এক হাতে ফিতা ছেঁড়া একটি স্যান্ডেল। সে দৌড়ে গেল স্কুলের কলপাড়ে। পা আর স্যান্ডেল ধুয়ে তাড়াতাড়ি ক্লাসরুমের দিকে দৌড় লাগালো। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েই সে হেডস্যারের গমগমা কণ্ঠ শুনতে পেলো। হঠাৎ করেই সালমানের বুকের ভেতরে কেমন করে উঠলো।

সমস্ত গ্লানি মাথায় নিয়েই সালমান যখন মনস্থির করলো যে, সে ক্লাসরুমে ঢুকে পড়বে তখনই সে শুনতে পেলো, হেডস্যার বলছেন : আজ আর তোমাদের এই ক্লাসটা হবে না। তোমাদেরই সহপাঠী আরিফুল রহমান, তোমরা জানো– অসুস্থ হয়ে বাড়িতে আছে। তার চিকিৎসার জন্য আজ দুপুর বারোটায় তাকে শহরে হাসপাতালে নেয়া হবে। আমি চাই, তোমরা তাকে গিয়ে দেখে আসো। আরিফদের বাড়ি স্কুলের কাছেই। যেতে দশ মিনিট লাগবে। এই ক্লাসের সময়ের মধ্যেই গিয়ে আবার চলে আসতে পারবে। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো। তোমরা এখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আর কয়েকদিন পরই তোমরা এক-একজন, হতে পারে একেক দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের পরস্পরের মাঝে সুন্দর ও উপকারী একটি সম্পর্ক থাকাই তো উচিত।

হেডস্যারের কথা শেষ হতে না দিয়ে কিছুটা খুশি খুশি মনেই সালমান ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লো। স্যার তার দিকে লক্ষ করতেই সে সালাম দিলো। সালমানকে অবাক করে দিয়ে স্যার বললেন : আরে সালমান! তোমার আজ দেরি হয়ে গেলো? তোমার হাতে ওটা কী? স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে? যাক আজ আর ক্লাস হচ্ছে না। তোমরা সবাই রেডি হয়ে নাও। আরিফদের বাড়ি যেতে হবে।'

হেডস্যারের মুখে এমন নরম ভঙ্গির কথাবার্তা শুনে আজ গোটা ক্লাসের সব ছাত্রই অবাক হয়ে গেলো। স্যারের এই রূপটাকে তো তারা চিনতোই না! সালমান বললো : 'জী স্যার! আমরা যাচ্ছি স্যার।' সালমানের সাথে সাথে অন্যরাও বললো : 'জী স্যার! আমরা সবাই যাচ্ছি।'

সবার ভেতরেই যেন উৎসাহ আর প্রেরণা ছড়িয়ে পড়লো। রুবেল শুধু কটমট করে সালমানের দিকে তাকাতে লাগলো। শিকার ফস্কে যাওয়ার আক্ষেপ তার দুই চোখে। গত শনিবার রুবেল যখন ক্লাসে পড়া শোনাতে পারেনি স্যার তখন সালমানকে ডেকেছিলেন। তারপর রুবেলের কানে ধরে একবার ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে নিয়ে আসতে আরেকবার বেঞ্চের সামনে নিয়ে যেতে সালমানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইচ্ছা না থাকলেও স্যারের গরম নির্দেশে সালমানকে সেই 'অপ্রিয় কাজ'টি করতে হয়েছিলো। সেই থেকে গোয়াড়-গোবিন্দ স্বভাবের রুবেল সালমানের উপর ক্ষেপে আছে। চান্স পেলেই সালমানকে সে ধরবে। সালমান রুবেলের দিকে তাকিয়ে সবার আড়ালেই হেসে ফেললো।

সবাই যখন ক্লাসরুম ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো তখন কালামের বিষণ্ন স্বর ভেসে এলো : স্যার! আমরা তো আরিফের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। কোনো ধরনের সেবাই করতে পরলাম না। শুধু শুধুই ওকে দেখতে গিয়ে কী লাভ হবে?

: হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। আসলেই উচিত ছিলো ওর কিছু কিছু সেবা তোমাদের করা। কিন্তু তোমরা এতোদিন পারোনি। এখন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওর পরিবারের লোকেরাই সেবা-শুশ্রূষা করছে। তবে তোমাদের জেনে রাখা ভালো, একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়াটাও কিন্তু অনেক বড় লাভের কাজ। এতেও অসুস্থ মানুষের উপকার হয় আর যারা দেখতে যায় তাদের অন্তরে জাগে সহানুভূতি ও মমতা। আরো একটি লাভ হচ্ছে, এর ফলে অনেক অনেক সাওয়াবও কিন্তু তোমরা পাবে। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায়, তাকে উদ্দেশ করে আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ফেরেশতা বলতে থাকেন, তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার এ পথচলাও ধন্যবাদযোগ্য। তুমি তো বেহেশতে তোমার জন্য একটি আবাস, একটি বাড়ি তৈরি করে নিলে।' [১]

স্যারের কথায় সবার মনেই মহৎ কিছু পেয়ে যাওয়ার একটি নীরব অনুভূতি গেঁথে গেলো। সবার মাঝেই যেন কিছুটা নীরবতা আর গাম্ভীর্য ছড়িয়ে পড়লো। স্যার বললেন : 'চলো চলো, তাড়াতাড়ি হাঁটো! সময় কম।' স্যারের পেছনে পেছনে সবাই হাঁটতে লাগলো। ছেঁড়া স্যান্ডেল রেখে খালি পায়েই সালমান হেঁটে চলছে। সে একদম স্যারের কাছাকাছি গেলো। দেখাদেখি রুবেল আর শাহীনও স্যারের পাশাপাশি চলে এলো। হেডস্যারের প্রতি ওদের যে ভীতি ছিলো, আজ যেন সব উঠে গেছে, উধাও হয়ে গেছে।

আরিফদের বাড়িটা এখন আর দূরে নয়। ঐ যে দু'টা বাড়ির পরই ওদের বাড়ি। ক্লাসের একজন ভদ্র ও ভালো ছেলে আরিফের অসুখটা আসলে কী, তা কেউ না জানলেও সালমান জানে, ডাক্তার সন্দেহ করেছেন, আরিফের টাইফয়েড হয়ে গেছে। রক্ত পরীক্ষা

করলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ডাক্তারের ধারণাও ভুল প্রমাণিত হতে পারে তখন। পরশু ক্লাস শেষে সালমান আরিফকে দেখতে গিয়েছিলো। তখনই এসব জেনে এসেছে সে। আরিফের শরীর একদম বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে।

আরিফদের বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছুতেই সালমান বললো : স্যার! আরিফের অবস্থাতো আমি দেখে এসেছি পরশু। খুবই খারাপ। সালমানের কথা শেষ করতে না দিয়ে স্যার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে থামতে বললেন। তারপর বললেন: শোনো! রোগীর সামনে গিয়ে রোগীর মন খারাপ হওয়ার মতো কোনো কথা বলতে নেই। অথচ আমরা এটা কেউ লক্ষই করি না। কেউ কেউ মুখটাকে আরো বিষণ্ন করে ফেলি। বলেও ফেলি, তোমার এতো খারাপ অবস্থা, জানতাম না। এসব একদম করবে না। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বাণী শোনো। তিনি বলেছেন: 'তোমরা যখন অসুস্থ মানুষের কাছে যাও, তখন তার জীবন সম্পর্কে আশাব্যাঞ্জক কথা বলো। তোমার এই কথা অসুস্থ ব্যক্তির তাকদীরের ফায়সালা যদিও খণ্ডতে পারবে না, কিন্তু তার মনটা এতে খুশি হয়ে যাবে।'[২]

স্যার বললেন : যতো মারাত্মক অসুস্থতাই থাকুক, তুমি যখন সেই অসুস্থ মানুষটাকে দেখতে যাবে তখন নবীজীর এই বাণীর কথা মনে রাখবে। আর আরিফের অবস্থা তো আসলে তেমন খারাপ নয়। নিশ্চিত করে এখনো ডাক্তার কিছু বলতে পারছেন না। তার শরীরের দিকে তাকিয়েই মুখ ফস্কে কোনো মন খারাপ করা কথা কেউ বলবে না। ঠিক আছে?' সবাই মাথা দোলালো।

আরিফদের বাড়ির সামনে যখন সবাই পৌঁছুলো, দেখলো ঘরের বাইরে বারান্দায় একটি চেয়ারে চাদর গায়ে বসে আছে আরিফ।

তার পাশে বসে আছেন তার আব্বা। হেডস্যার ও আরিফের সহপাঠীদের আসতে দেখে আরিফের বাবা দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সালাম জানালেন। আরিফের আব্বার যেন তর সইছে না। তিনি বললেন : 'স্যার! আরিফের টাইফয়েদ হয়নি। গতরাতে ওর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণ মৌসুমী জ্বরেই ও ভুগছে। গতকাল থেকে ওর শরীরটাও কিছুটা ভালো যাচ্ছে। এখন আপনারা দুআ করবেন।'

হেডস্যারসহ সবাই এক সঙ্গে হাসিমুখে বলে উঠলো– 'আলহামদুলিল্লাহ!' হেডস্যার বললেন, অবশ্যই আমরা দুআ করবো। ইনশাআল্লাহ আরিফ কয়েকদিনের মধ্যেই পুরো সুস্থ হয়ে যাবে। সবাই ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে পড়লো। ⊙

মানুষের সেতু

আরাফাত যখন বাসায় এলো তখন বাসা একদম খালি। আব্বা-আম্মা চলে গেছেন খালাম্মার বাসায়। আপাও কাল থেকে হোস্টেলে। সে বাসায় ঢুকলো পাশের বাসা থেকে চাবি নিয়ে। শরীরটা বিছানায় ছেড়ে দিয়েই চোখ বুঁজে ফেললো। ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে স্কুলের ঘটনাটা। শাহেদের সাহস তো কম নয়। তাকে সবার সামনেই অপমান করলো সে। গতবারের এসএসসির রেজাল্ট তার খারাপ হয়েছে বলেই যে, সে নতুন এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে; এ কথাটা শাহেদের এভাবে না বললেও চলতো। দীর্ঘদিনের এই বন্ধু আজ রাগারাগির এক পর্যায়ে তাকে একদম ডুবিয়ে দিলো। নতুন বন্ধুদের সামনে মুখে চুনকালি লাগিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাটি ঘটালো শাহেদ।

আরাফাত ঘুমাতে না পেরে বারান্দায় এসে বসলো। প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছে তার। বিকাল এখনো শুরু হয়নি। রোদের তাপটা আছে। চারতলার বারান্দা থেকেই শোনা যাচ্ছে, পাশের গলি মুখর করে তোলা গাড়ি আর রিকসার ব্যস্ত চলাচলের একঘেয়ে শব্দ। আরাফাতের কিছুই ভালো লাগছে না। ভাত খেতেও ইচ্ছা হয়নি।

বিকালে কলোনীর মাঠে ক্রিকেট খেলতে যাওয়াটাও আজ আর হবে না। বার বার অপমানের বোধ তাকে বিষণ্ন করে দিচ্ছে। সে সিদ্ধান্ত নিলো, শাহেদের সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই। কথাই বলবে না সে শাহেদের সাথে। তার কাছে যে গল্পের বইগুলো রয়েছে শাহেদের, কালই স্কুলে গিয়ে মনিরের মধ্যস্থতায় ফেরত দিয়ে দেবে।

আরাফাত আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। অল্প কিছুক্ষণ পরই আসরের আযান দিলো মহল্লার মসজিদে। সঙ্গে সঙ্গেই কলিং বেলেরও শব্দ হলো। সম্ভবত আব্বা-আম্মা এসেছেন, আরাফাত ভাবলো। কিন্তু দরজা খুলেই আরাফাত দেখলো, মনির দাঁড়িয়ে আছে। আরাফাত সরে দাঁড়াতেই মনির ভেতরে চলে এলো।

মনির! তুই এসে ভালোই করেছিস্। আমার কাছে শাহেদের কিছু বই আছে। ওগুলো তুই ওকে পৌঁছে দিবি। ঐ হিংসুক শয়তানটার সাথে আমি আর কথা বলছি না।

আরাফাত কথাগুলো একদমে বলেই শেল্‌ফে রাখা দশ-বারটা বই ঝটপট হাতে উঠিয়ে নিলো। তারপর সোফায় বসে থাকা মনিরের হাতে বইগুলো তুলে দিলো। মনির চুপচাপ ছিলো এতক্ষণ। আরাফাতের মনের অবস্থাটা সে আন্দাজ করতে পারছে পুরোপুরিই। এক ক্রিকেটারের একটি ব্যাটিং-স্কোর নিয়ে তর্ক আর ঝগড়ার এক পর্যায়ে শাহেদের এই কাণ্ডটা একদম ভালো লাগেনি মনিরেরও। এবার সে মুখ খুললো: ঠিক আছে। বই পৌঁছানো দরকার, পৌছে দেবো। কিন্তু অস্থির হওয়ার কী আছে। শাহেদ তো আসলে তোর বন্ধু, আজ একটি ভুল সে করেছে তোকে কষ্ট দিয়ে। সে ভালো ছাত্র বলেই তোকে অপমান করাটা তার ঠিক হয়নি। কিন্তু তাই বলে কি শাহেদের সাথে এখনই সব চুকিয়ে বুকিয়ে দিতে হবে?

: হ্যাঁ। ওই হিংসুক ভালো ছাত্রের সাথে আমি আর কথাই বলছি না। ওর তো মনটাই ছোট।

: শোন্ আরাফাত! তুই আসলে কষ্ট পেয়ে গেছিস্ বলে তোর মনের অবস্থাটা এখন অনেক খারাপ হয়ে আছে। কিন্তু শাহেদও যে তোর খুবই ভালো একজন বন্ধু, এটা কিন্তু তুই অস্বীকার করতে পারবি না। গত মাসে পত্রিকায় যখন তোর গল্প ছাপা হলো, শাহেদই সেটা গোটা ক্লাস জুড়ে সবাইকে দেখিয়েছে। স্যারদের রুমে রেখে এসেছে পত্রিকার কপি। তোর ব্যাপারে মহল্লার কেউ কোনো বাজে মন্তব্য করতে চাইলে শাহেদকে দেখেছি ক্ষেপে যেতে। আজকের ব্যাপারটাই শুধু ভিন্ন। এটা ভুলে যা।

: দরকার নেই। আমি শাহেদের সাথে কথাই বলছি না। তুই আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করবি না।

: ঠিক আছে বুঝানোর চেষ্টা করব না। শাহেদ যে আমার হাত ধরে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে, সেটা তো বলে যাওয়া দরকার। বলে গেলাম। শাহেদ বলেছে– আরাফাতকে বলবি– আমি লজ্জিত। তুই যদি মাঠে খেলতে যাস্ তাহলে শাহেদের সাথে দেখা হবে। শাহেদের চিটাগাং যাওয়ার কথা ছিলো তার আব্বার সঙ্গে। সে যায়নি শুধু তোর সাথে কথা বলার জন্যই। এখন তোর ইচ্ছা।

মনির কথা শেষ করে উঠে দাঁড়লো। আরাফাত চুপ করে বসে রইল কিছু না বলে। এরপর মনির যখন চলে যেতে চাইল, আরাফাত বললো : দাঁড়া! আমি ভাত খেয়ে নিই। তারপর চল্ ওযু করে আসরের নামাযটা পড়ে ফেলি। তুই ভাত খেয়েছিস?

আরাফাতের বিষণ্নতা ও ক্ষোভমুক্ত ঝরঝরা কথায় মনির খুশি হয়ে বললো : হ্যাঁ, আমি ভাত খেয়েছি। স্কুল থেকে ফিরেই ভাত খেয়ে

শাহেদের বাসায় গিয়েছিলাম। তুই খা, আমি বাথরুমে যাচ্ছি ওযু করতে।

আসরের নামায শেষ করে তারা বাসা থেকে বের হতে যাবে, তখনই কলিং বেলের শব্দ হলো আবার। আরাফাত দরজা খুলে দেখলো, তার আব্বা-আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সামনে। তাদের পেছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে শাহেদ। আরাফাত কিছুই বুঝলো না। মনিরও কিছুটা অবাক হলো। শাহেদের তো এখানে আসার কথা নয়। আরাফাতের আম্মা শাহেদকে ভেতরে এসে বসতে বললেন। শাহেদ বললো : না, খালাম্মা! বসবো না, আব্বার সঙ্গে সন্ধ্যার পর আমাকে চিটাগাং রওয়ানা দিতে হবে। এজন্যই একটু এসেছিলাম।...

: ঠিক আছে, যাও। বসে আলাপ করো তোমরা! আমি একটু তোমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করি।' আরাফাতের আম্মা বললেন। তখন তাদের পাশে এসে বসলো আরাফাতের আব্বা।

শাহেদ বললো : খালু! আসলে আমি স্কুলে আজ আরাফাতকে একটা কথা বলে একটু কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছি। এভাবে কথা বলে ওকে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার চোখ খুলে দিয়েছে মনির।'

আরাফাতের আব্বা কিছুটা অবাক-হওয়া চোখে তিন বন্ধুর দিকে তাকালেন। তারপর হাসি মুখে বললেন : তোমাদের মধ্যে আবার ঝগড়া-ঝাঁটি হয় না কি? খালুর কথায় তিনজনই হেসে ফেললো। শাহেদ বললো : খালু! ঝগড়া নয়, সমস্যাটা আসলে আমারই তৈরী। এ সমস্যাটার কারণে আমার আর আরাফাতের মাঝে হয়তো স্থায়ী ঝগড়াই হয়ে যেতো। কিন্তু মনির আমাকে বুঝিয়েছে। শাহেদের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আরাফাত

কিছুটা মিইয়ে যাওয়া স্বরে বললো : আমাকেও তো বুঝাতে এসেছে মনির।'

মনির হাসতে লাগলো। আরাফাতের আব্বা তিন বন্ধুকে সোফায় বসতে বলে বললেন : শোনো তোমরা! মনির আজ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজটি করেছে। বন্ধুর জন্য তো বন্ধুর শুধু নয়, এই ভালো কাজটি করার যোগ্যতা সব মানুষেরই থাকলে ভালো হতো। মানুষের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এখন উল্টো আমরা একজনকে আরেকজনের পেছনে লাগিয়ে দিই। খালুর কথা মাথা নিচু করে শুনতে লাগলো তিন বন্ধু। মনির যেন লজ্জাই পেয়ে গেলো একটি ভালো কাজ করে, এমন একটি ভঙ্গি নিয়েই বসে আছে সে।

কিছুক্ষণ পর প্লেটে সাজিয়ে ছোট ছোট পিঠা আর চা দিয়ে গেলেন খালাম্মা। তারপর খালু বললেন : 'তোমরা যদি বাইরে একটু হাঁটতে বের হতে চাও, চা খেয়ে এখনই বের হয়ে পড়ো। মাগরিবের আযান হতে বেশি বাকি নেই।' কথা শেষ করে খালু মনিরের হাতে একটি পিঠা তুলে দিয়ে আবার বললেন : আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস তোমরা শুনবে?

তিন বন্ধুই সম্মতি জানিয়ে মাথা কাত করলো। প্রতিটি কথাই ভালো লাগছে তাদের। খালুকে মনির ও শাহেদ আগেও খুব কমই রাগ করতে দেখেছে। হাসিমুখ একজন মানুষ তিনি। আজ যখন সেই খালু বন্ধুদের, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন তখন মনে হচ্ছিলো, খালু যেন তাদের সমান্তরাল একজন মানুষ। খালুর কথাগুলো শোনার জন্য তাদের প্রতিটি কান তাই প্রস্তুত হয়েই আছে।

আরাফাতের আব্বা বললেন : নবীজী (সা.) বলেছেন– 'আমি কি তোমাদেরকে নফল নামায-রোযার চেয়েও উত্তম একটি জিনিসের কথা বলবো না? সেটা হচ্ছে পরস্পরের মাঝে সমঝোতা ও সুসম্পর্ক তৈরি করে দেয়া। আর তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকবে। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ (পুণ্যকে) চেঁছে শূন্য করে দেয়।'[৩]

খালুর কথায় যেন একটি সুন্দর দিগন্ত খুলে গেল তিন বন্ধুর সামনে। আরাফাত, শাহেদ আর মনির উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ করেই যেন ওরা অনেক পরিণত হয়ে উঠলো। মনির বললো : খালু! আমাদের জন্য আপনি দুআ করবেন।

আরাফাতের আব্বা মনিরের কথায় কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর মুখে শুধু আশ্বাস ও আদরের স্মিত একটি হাসি ফুটে উঠলো। ⊙

স্বচ্ছ আলোর মুখ

উঠানের এক কোণে খড়ের পালা। অপর কোণে আছে ছোট্ট একটি গোয়াল ঘর। বারান্দার সাথেই মাটি দিয়ে বানানো মুরগির খোঁয়াড়। আর বড় একটি আমগাছের নিচে সারাটা উঠান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাকা ধানের আঁটি। সেই সব ধানের আঁটির উপর কয়েকটি মুরগি খুঁটে খুঁজে খাবার খাচ্ছে। বারান্দায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে এই দৃশ্যটাই দেখছে রাবেয়া।

হাতের কাছে টিনের কৌটাটাতে ছিলো কিছু গুঁড়ো হয়ে যাওয়া চালের কণা, কিছু ধানের টুকরো। কিন্তু মুরগিগুলোর দিকে সেগুলো ছিটিয়ে দেওয়ার এখন আর কোনো দরকার মনে করছে না রাবেয়া। উঠানে ছড়ানো ধানের আঁটিতেই এখন সেগুলো মজে আছে। নতুন কেনা এই চারটা মুরগি গত বৃহস্পতিবার ভাইয়া এনেছে কুমুদগঞ্জ বাজার থেকে। আনার পর পরই দুটা মুরগি ডিম দিয়েছে ঘরে বাঁধা অবস্থাতেই। গতকাল থেকে তিনটা ডিম দেখা যাচ্ছে মুরগির খোঁয়াড়ে। তার মানে তিনটি

মুরগি-ই এখন ডিম দিচ্ছে। ব্যাপারটা রাবেয়ার কাছে দারুণ লাগছে।

তাকী ভাইয়া আগেও নেত্রকোণা শহর থেকে আসার পথে কুমুদগঞ্জ থেকে মুরগি কিনে এনেছিলো। কিন্তু এমন মজার আর আনন্দের ব্যাপার কখনো ঘটেনি যে, কিনে আনার দিনই ডিম দিতে শুরু করেছে মুরগি। খুশিতে রাবেয়া আজ বিভিন্ন সুযোগে জমানো টাকা থেকে একশটি টাকা ভাইয়ার হাতে তুলে দিয়েছে। ভাইয়া তার জন্য আরো দুটি মুরগির বাচ্চা কিনে আনবে। ভাইয়া বাজারে চলে গেছে দুপুরের খাবার খেয়েই। সাথে নিয়ে গেছে ঘরে জমে যাওয়া প্রায় চল্লিশটি ডিমের একটি ঝাঁকা। সেগুলো বিক্রি করতে পারলে দুটি হাঁসের বাচ্চা কিনে আনবে সে। ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যা তো হবেই।

ডিমগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্য আম্মা ভাইয়াকে বলেছিলেন : 'তাকী! ডিমগুলো যে বেচার জন্য নিয়ে যাচ্ছিস্, ডিমগুলো তো মনে হয় সবগুলো ভালো নেই। ডিম খারাপ থাকলে তো বিক্রি করা ঠিক হবে না।' আম্মার কথা শুনে ভাইয়া মোটেই দমে যায়নি। বাড়ির উঠান পার হতে হতেই বলেছে : 'সবগুলো ডিমই তো আর নষ্ট নয়। কিছু নষ্ট হলেই বা কি? ডিম তো একটা একটা করে কেউ ভেঙ্গে দেখছে না।' আম্মা আরও কী বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ভাইয়া গায়েব। রাবেয়া তখন দেখেছে, তার কম কথা-বলা আম্মার মুখটা কালো হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা যখন প্রস্তুতি শুরু করে কুমুদগঞ্জের বাজার তখন থেকেই পাতলা হয়ে যেতে থাকে। সন্ধ্যার পর কোনো কোনো গাছের

নিচে দু-একটি লণ্ঠন জ্বললেও বাজার চলাকালে লাখো মৌমাছির একসঙ্গের গমগমা গুঞ্জনের মতো যে ধ্বনিটা ভেসে আসে, সেটা তখন পুরোপুরি বিদায় হয়ে যায়। সন্ধ্যার আগেই তাই দু-এক মাইল দূরের ক্রেতা-বিক্রেতাদের বিদায় গ্রহণ শুরু হয়ে যায়। তাকীও বাজার থেকে বের হয়ে পড়লো সন্ধ্যার আগে। শুকিয়ে যাওয়া নদী সোমেশ্বরীর উপর তখন ফ্যাকাসে লাল সূর্য। বাজার থেকে বের হওয়ার সময় তাকীর ডান হাতে দুটি মাঝারি উচ্চতার হাঁস উল্টো করে ধরা। বাঁ হাতে তার একজোড়া মুরগির পায়ের মাথা। দৌড়ে দৌড়ে ছুটছে সে বাড়ির দিকে। কিছুটা খুশি আর তাড়াহুড়া তার আচরণে।

বাড়ির কাছের মসজিদ-মোড়ে আসতেই তাকী থেমে পড়লো। আর হেঁটে যেতে ইচ্ছা করছে না তার। রাগে-দুঃখে তার হাত-পা কাঁপছে। এখনই সম্ভবত আযান হবে মাগরিবের। ঘণ্টাখানেক আগের খুশি আর ব্যস্ততার কোনো আলামতই এখন আর তার চেহারায় নেই। আসার পথে মিনিট দশেক বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে তাকে। আশে-পাশে দাঁড়ানোর মতোও কোনো জায়গা ছিলো না তখন।

বৃষ্টি যখন প্রায় থেমে গেছে তখনই তাকী লক্ষ করেছে, ডান হাতে ধরা হাঁসগুলোর কোনোই নড়া-চড়া নেই। হেঁটে আসার সময় হাঁসগুলোর মুখ থেকে কয়েকবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ বের হয়েছিলো। বৃষ্টির পর সেগুলো নিথর হয়ে গেছে। কিছুটা শক্তও হয়ে গেছে। তখনই ঘটনা বুঝতে পেরে তাকী হাঁসগুলোকে পাশের ক্ষেতে ফেলে দিয়েছে। মৃত হাঁসের বোঝা বয়ে তো আর কোনো লাভ নেই! আর এখন মসজিদ-মোড়ে এসে সে দেখলো,

মুরগি দু'টাও ঝিমাতে শুরু করেছে। মারাত্মক অবস্থা! তাকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুরগি দু'টার দিকে বার বার লক্ষ করছে। তার কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

শেষ-মেশ প্রায় এক দৌড়ে বাড়িতে এসে তাকী তাদের বারান্দায়– মাটিতেই বসে পড়লো। তখন মাগরিবের আযান শুরু হয়ে গেছে মসজিদের মাইকে। মুরগির খোঁয়াড়ের ছোট্ট দরজাটা আটকানো শেষ করেই রাবেয়া এসে দাঁড়ালো তাকীর সামনে। ভাইয়ার পাশে ঝিমাতে থাকা মুরগি দু'টার দিকে তাকিয়ে রাবেয়ার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। তারপর ভাইয়ার হতবিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে রাবেয়া ভয় পেয়ে গেলো। একছুটে কলপাড়ে গিয়ে তার আম্মাকে ডাকলো।

ওজু শেষ করে নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন রাবেয়া ও তাকীর আম্মা। তিনি তাকীর দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। তাকী তার আম্মার কাছে একদমে হাঁসগুলোর মরে যাওয়া থেকে নিয়ে মুরগির এই ঝিমাতে থাকার বর্ণনাটা দিলো। তারপর বললো : 'আম্মা! বিশ্বাস করো, কেনার সময় আমি হাঁস-মুরগি প্রতিটি দেখে কিনেছি। একদম চনমনা ঝনঝনা না হলে আমি এই হাঁস-মুরগিগুলো কিনতামই না।'

তাকীর কথা শুনে রাবেয়ার মনে দুঃখ ছড়িয়ে পড়লো। যেন স্বপ্ন আর সুখের একটি সম্ভাবনা তার সামনে থেকে অবিশ্বাস্যভাবেই দূরে সরে গেছে এখন। কিন্তু তাদের আম্মার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। বরং তাঁর চোখ দুটো যেন হঠাৎ করেই জ্বলে উঠলো। রাগত স্বরে তিনি বললেন : 'বাজারে যাবার সময়ই

তোকে আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ডিমগুলো নিয়ে তুই যাস্‌নে। তুই আমার কথাই শুনলি না। চলে গেলি। চালাকি করতে চাইলি। ভালো দেখেই হাঁস-মুরগিগুলো কিনেছিস্– বললি। কিন্তু তোদেরকে আর কতো বলতে হবে এই কথাটা যে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কোনো লাভ করতে চাইলে আল্লাহ্ ছাড়েন না। আল্লাহর কাছে কোনো ফালতু চালাকি খাটে না।'

এমনিতেই আম্মা গম্ভীর ধরনের মানুষ। আজ আম্মার কথাগুলো আরও বেশি গম্ভীর আর ওযনদার মনে হলো তাকীর কাছে। তাকীর আম্মা ওযুতে ধোয়া হাত-মুখ গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে আবারও বললেন : 'মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। ওযু করে নামায পড়তে যাবি, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। আর শোনে রাখ, আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস। তিনি বলেছেন : যেই লোক কোনো দোষযুক্ত, ত্রুটিযুক্ত জিনিস ক্রেতাকে না জানিয়ে বিক্রি করলো, সে সব সময় আল্লাহর রাগ আর ক্রোধের মাঝেই পড়ে থাকবে এবং ফেরেশতাগণ তার উপর সবসময় অভিশাপ দিতে থাকবেন।[৪]

'এই হাদীসের কথাগুলো জীবন ভর মনে রাখবি। কখনো অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে গেলেও এই কথাগুলোর প্রতি বিশ্বাস যেন দুর্বল না হয় তোর। নামায শেষে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবি আর আগামী বাজারে গিয়ে ডিমগুলো যার কাছে বিক্রি করেছিস্ তাকে খুঁজে বের করবি। লজ্জা ভেঙ্গে ক্ষমা চাইবি। ডিম বিক্রির টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দিবি। বাজারে যাওয়ার সময় টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস্।'

তাকী তার আম্মার সামনে যেন আর দাঁড়াতেই সাহস পাচ্ছে না। আসলেই তো সে কাজটা ভালো করেনি। আল্লাহ তাকে সামান্য শাস্তিই দিয়েছেন। আর আম্মার কথাগুলো যেন তার মনের ভেতরে জমে থাকা স্বচ্ছ একটি আলোর উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। তাকী দ্রুত স্যান্ডেল পায়ে লাগিয়ে বাইরে ছুটলো। নামাযের জামাত ধরতে হবে। কিশোরী রাবেয়া তখন বড় অবাক হওয়া চোখে একবার ভাইয়ার দিকে আরেকবার আম্মার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো। ⊙

তাদের জন্য কাজ

বিছানা ছেড়ে উঠতে আজ সবারই দেরি হয়েছে। সূর্য এখন কিছুটা তাপ ছড়াচ্ছে। আলোটায় ধাক নেই তেমন। কুয়াশার পাতলা চাদর সরে গেছে কিছুক্ষণ হলো। আটটার মতই বাজে। বাড়ি ভর্তি মানুষের অনেকেই ফজরের নামাযের সময় উঠে নামায পড়েই আবার শুয়ে পড়েছিলেন। এখন তারাও জেগে উঠেছেন। গত রাতে সবার ওপর দিয়েই শোক আর ঘুমভাঙ্গা ব্যস্ততার একটি ঝড় বয়ে গেছে। ছোটদের গায়েও এ ঝড়ের বাতাস লেগেছে। তারেকের শরীরটাও মেজ মেজ করছে এখন। তারপরও সে আম্মার কথায় বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো।

গতকাল দুপুরে দাদা মারা গেছেন তারেকের। শহরের হাসপাতাল থেকে তার দাদার লাশ বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলো সন্ধ্যার আগে। লাশের সঙ্গে ট্রাকে ছিলেন তার ছোট চাচা। বড়দের মধ্যে অন্যরা যারা শহরে ছিলেন, তাদের অনেকে আগেই বাসে চড়ে চলে এসেছেন। তারেকের আব্বা নজরুল সাহেব, বড় চাচা আর দুই ফুপা বাড়িতে আসার পর সন্ধ্যার আগেই কবর খনন সহ দাফন-কাফনের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ছোট দুই দাদা অবশ্য তখন বাড়িতেই ছিলেন। তারা দু'দিন আগেই হাসপাতাল থেকে ঘুরে এসেছেন। তারা তারেকদের বাড়ির খাবার-দাবার, দাদাকে দেখতে আসা এবং জানাযায় শরিক হতে আসা সব আত্মীয়দের থাকা-টাকার ব্যবস্থা করতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। তারেকের দাদার জানাযা হতে হতে রাত এগারটা বেজে গিয়েছিলো। তারেকের দাদা ছিলো ওদের বংশের সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন আর স্নেহশীল মানুষ। সবাই তাঁকে মানতো আর ভালোবাসতো। নিজের ছেলেদের কথা তো আছেই, এলাকার বহু সাধারণ মানুষকেও গত রাতে তারেক দেখেছে, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখ মুছছে।

তারেককে বাড়ির বাইরে দেখে বড় চাচা বললেন : তোর আব্বাকে আর বাড়ির বড়দের সবাইকে গিয়ে বল, 'সবাই যেন নাস্তার পর বাইরের ঘরে এসে বসে। জরুরি আলোচনা আছে।' তারেক বললো : চাচা আগে নাস্তা নিয়ে আসি। পরে সবাইকে গিয়ে বলি?

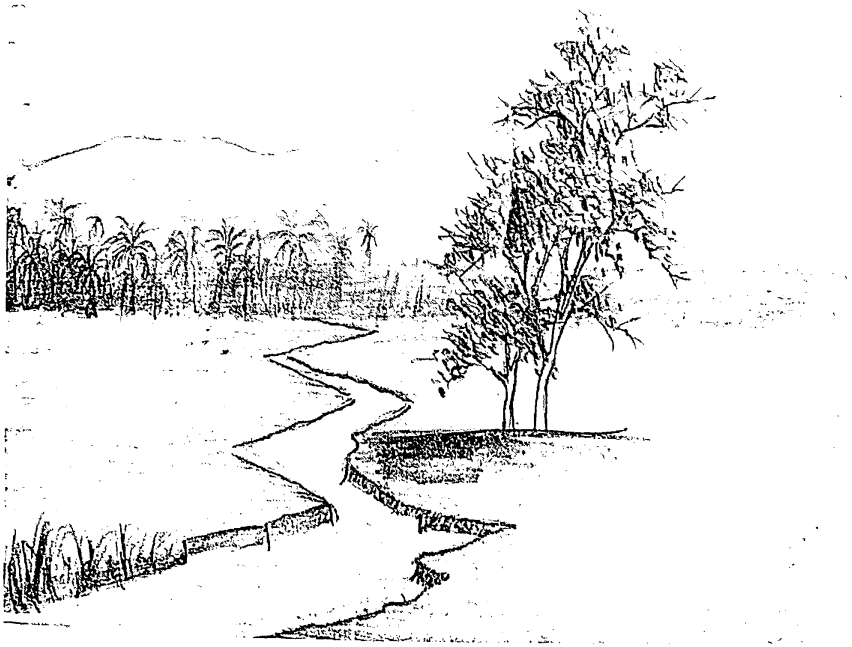
: ঠিক আছে। তাই কর। তারেকের কাছে মনে হলো, বড় চাচার গলার স্বর ভাঙা ভাঙা। শোকে আর মানসিক চাপে তিনি আসলেই অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছেন।

তারেক ও তার বড় চাচার ছেলে তারেকের সমবয়সী রাশেদ বাড়ির ভেতর থেকে নাস্তা এনে এনে সবাইকে খাওয়ানোর কাজ করলো। তারপর আম্মা-চাচীর সঙ্গে বসে তারাও নাস্তা করলো। তারেক ও রাশেদ সবাইকে বড় চাচার ঘোষণা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এঘর-ওঘর যেতে লাগলো। বড়দের সবারই প্রায় চোখ-মুখ ফোলা ফোলা। শোক আর কান্নার ছাপ সবার মুখে।

নয়টার দিকে বাড়ির বাইরের উঠানে আলোচনার জন্য বড়দের সবাই বসলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে বড় চাচাকে উদ্দেশ করে

ছোট ফুপা বললেন : 'ভাইজান! আপনি চাচ্ছেন আব্বার জন্য আমরা এমন কিছু করি, যাতে তাঁর উপকার হয়। এজন্য বড় কিছু করার চেষ্টায় দেরি করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। আমরা ভালো কিছু করার কাজটি এখন থেকেই শুরু করতে পারি।'

ছোট ফুপার কথায় সবাই মনোযোগী হয়ে উঠলেন। তারেক চা এগিয়ে দিচ্ছে সবার হাতে হাতে। রাশেদের হাতে পানের থালা। তারেকের আব্বা নজরুল সাহেব বললেন : মৃত মানুষের তো নিজের জন্য নিজের কিছু করার আর সুযোগ নেই। তাঁর উপকারের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের তো অবশ্যই কিছু করা দরকার। আম্মাও আমাকে বললেন, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে। এখন আপনারা সিদ্ধান্ত নিন। সবার কথার মাঝেই বিনয়ের সাথে সাহস করে তারেক বললো : বড় চাচা! আমি ছোট্ট একটি কথা বলতে চাচ্ছিলাম। তারেকের কথা শুনে সবাই যেন সচকিত হয়ে উঠলেন। বড় চাচা বললেন : 'বল্ তুই কি বলবি।'



তারেকের গলায় যেন কিছু একটা আটকে যাচ্ছে। বড়দের সামনে এভাবে কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে সে আগে কখনো পড়েনি। তারপরও দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সে বললো : গত বৃহস্পতিবার এশার পর মসজিদের তালীমে বসেছিলাম। তখন সেখানে একটি হাদীস পড়া হয়েছিলো। সেটা পরে আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। সেখানে বলা হয়েছে– আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা.-এর আম্মা মারা গেছেন, তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তিনি বাড়ি ফিরে এসে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আম্মা মারা গেছেন যখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু দান- খয়রাত করি, তাহলে এটা কি তাঁর উপকারে আসবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন– হ্যাঁ। সা'দ (রা.) তখন বললেন : আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর নামে দান করে দিলাম।'[৫] কথা শেষ করতেই যেন তারেকের ঘাম ছুটে গেলো। তার একটু লজ্জা লজ্জা করতে লাগলো।

বড় চাচা বললেন : তুই তো সুন্দর একটি হাদীস আমাদেরকে শোনালি। আমরা তো এভাবেই চিন্তা করতে পারি।

বড় চাচার কথায় সবাই সম্মতি জানালেন। ছোট চাচা বললেন : স্কুলের পাশে আব্বা যে চার কাঠা জায়গা গত বছর কিনে রেখেছিলেন, সেই জায়গাটা নিয়ে আমরা একটা কিছু করতে পারি। সওয়াবের উদ্দেশ্যে আমরা একটা মসজিদের কাজ শুরু করে দিতে পারি সেখানে। এদিকে কোনো মসজিদ নেই। মসজিদের দরকারের কথা অনেকে বলছেনও। বড় চাচা, ছোট চাচা, বড় ফুপা এবং ছোট দাদা একসঙ্গে বলে উঠলেন : এটাই করা হোক।

মুরব্বীদের কারো কারো হাতে তারেক ও রাশেদ পান তুলে দিচ্ছে। বড় চাচা দাঁড়িয়ে বললেন : 'আমি একটু আম্মাকে বলে আসি মসজিদের কথাটা। তারেক-রাশেদের দুই ফুপুরও তো অনুমতি লাগবে। ভেতরে গিয়ে কথাটা বলা দরকার।' কথা শেষ করেই বড় চাচা ভেতরে চলে গেলেন। তখন রাশেদ ফিসফিস বললো তারেককে : 'কী সুন্দর একটা হাদীস তুমি মুখস্থ করেছো! সবাই খুশি হয়ে গেছেন তোমার কথা শুনে।' তারেক স্মিত হাসলো।

পাঁচ মিনিট পর বড় চাচা ফিরে এসে বললেন : আম্মাসহ সবাই মসজিদ বানানোর কথাটি শুনে খুব খুশি হয়েছেন। আম্মা তো কাল থেকে কাঁদছেন। বিছানায় শুয়েই আছেন। আম্মার কান্না তো আমরা থামাতে পারবো না। কিন্তু আমাদের এই মসজিদ বানানোর কথাটা শুনে আম্মা উঠে বসেছেন। অনেকটা উৎসাহী মানুষের মতোই বলেছেন– একটি ভালো সিদ্ধান্ত তোরা গ্রহণ করলি। ছোট ফুপা তখন বললেন : ভাইজান! মসজিদ বনাতে তো প্রস্তুতির দরকার। একটা কাজ আমরা আজ থেকেই শুরু করে দিতে পারি। সেটা হচ্ছে আব্বার জন্য মাগফিরাতের দুআ। এটা খুবই জরুরি। প্রতি নামাযের পরই আমরা প্রত্যেকেই একবার সূরায়ে ফাতেহা আর তিনবার কুল হুয়াল্লা সূরা পড়ে আব্বার নামে দুআ করতে পারি। সওয়াব তার নামে পাঠাতে পারি। সংক্ষিপ্ত একটি কাজ এটা। কিন্তু বিরাট উপকার। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীসের বাণী সবারই শোনা দরকার মনে করছি।

ছোট দাদা দ্রুত বলে উঠলেন : বলো জামাই। আমরা শুনবো। তারেক একটি হাদীস বলেছে, যার ফলে সুন্দর একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ হয়েছে। তুমি বলো। অবশ্যই হাদীসটি আমাদের শোনা দরকার। বড় চাচা, নজরুল সাহেবসহ সকলেই মাথা দুলালেন ছোট দাদার কথায়।

ছোট ফুপা বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা ঠিক ঐ ডুবন্ত ব্যক্তির মতো, যে জীবন বাঁচানোর জন্য সাহায্যের আশায় চিৎকার ও ফরিয়াদ করতে থাকে। মৃত ব্যক্তির বাবা-মা, ভাই ও বন্ধুদের দুআর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর সে যখন তাদের দুআ লাভ করে তখন এটা তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল জিনিস থেকে বেশি প্রিয় মনে হয়। মহান আল্লাহ দুনিয়াবাসীর দুআর বরকতে কবরবাসীর উপর পাহাড় সমান রহমত ও মাগফিরাত দাখিল করে থাকেন। আর মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হলো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।'[৬]

ছোট ফুপার কথায় আলোচনায় উপস্থিত সকলের মাঝেই যেন একটি প্রশান্তির নীরবতা নেমে এলো। সবাই নিজ নজি দায়িত্বের কথা মনে করে আরো গম্ভীর, আরো সম্পন্ন হয়ে উঠলো। প্রত্যেকেই যেন নিজস্ব শোক ও হতবিহ্বলতা দূর করার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় ও অবলম্বন খুঁজে পেলো। বড় চাচা তখন কান্না কান্না সুরে বললেন : চলো এখনই আমরা আব্বার জন্য দুআ করি। আজ আর আলোচনার দরকার নেই। মসজিদের বিষয়টি পাকা হয়ে গেলো। আগামী মাসের শুরুতে অফিস ছুটি হলেই আমরা ঢাকা থেকে এসে কাজ শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। ⊙

বিষের স্বাদ

তানিয়াদের বাসায় এখন ভিন্ন পরিবেশ।

সকালে ঢাকা থেকে খালাম্মা এসেছেন। সঙ্গে খালাতো ভাই-বোন। বাসার প্রতিটি রুমই গমগম করছে। আম্মা-আব্বা সহ সবাই খালাম্মা-খালুদের সাথে যার যার গল্প করছে।

তানিয়া তারই সমবয়সী খালাতো বোনের সাথে গল্প-সল্প করে বিকাল পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছে। সে-ও ডুবে গিয়েছিলো পুনর্মিলনের আনন্দে। মাগরিবের আযান দেওয়ার পরই তানিয়ার মনে হয়েছে, নাহ্ আর হেলাফেলা করা ঠিক হবে না। কালতো ইংলিশ পরীক্ষা। পাশেই নানুর বাসায় গিয়ে ছোট খালাম্মার টেবিলে বসে পড়তে হবে বই নিয়ে। ছোট খালাম্মা যদি একটু দেখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন তাহলেই তার পড়াটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

মাগরিবের নামাযের পর। ছোট খালাম্মার ঘরটাও এখন ফাঁকা নেই। তানিয়া এসে দেখলো, এখানেও গল্প-সল্পের মজায় মেতে

আছে সবাই। ছোট খালাম্মাও বলে ফেললেন : 'আজ আবার তোর সঙ্গে টেবিলে বসতে বলবি না। আমরা এখন গল্পে ব্যস্ত।' ছোট খালাম্মার কথায় তানিয়ার মন খারাপ করা অবস্থাটা আরো বেড়ে গেলো। আজ তো তারও পড়তে বসতে ইচ্ছা করছে না একদম। কিন্তু কাল যে পরীক্ষা। কী করা যাবে।

তানিয়া টেবিলের একপাশে বই-পত্র রেখে পড়তে বসে গেলো। ছোট খালাম্মাকে আবেদনের সুরে শুধু বললো : খালামনি! গল্পের মাঝেই মাত্র পনের মিনিট আমার পড়াটা বুঝিয়ে দেবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। কিন্তু তানিয়ার কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপই করলো না, ছোট খালাম্মাতো নয়ই। মেঝো খালাম্মা, বড় খালাতো বোন– রাজিয়া আপা, নাসরিন খালাম্মা আর ছোট খালাম্মা যেন গল্পে বিভোর হয়ে আছেন।

তানিয়া নতুন শব্দগুলো গভীর মনোযোগের সাথে মুখস্থ করতে লাগলো। বার বার শব্দগুলো পড়ে পড়ে খাতায় মুখস্থই লিখছে আর বানান মিলিয়ে দেখছে। বানানের ভুলটাই যেন আজ বেশি হচ্ছে। ইংলিশ থেকে বাংলা আর বাংলা থেকে ইংলিশ অনুবাদের অধ্যায়টা উল্টিয়েই তানিয়ার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। এই কাজটা এখনো তার কাছে সহজ হয়ে উঠেনি। ছোট খালাম্মা যদি একটু সাহায্য না করেন তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। কিন্তু খালাম্মাদের কেউ তো এদিকে তাকাচ্ছেই না।

তানিয়া টেবিলের সামনে থেকে খালাম্মাদের পেছনে গিয়ে বসলো। খালাম্মা, আম্মা, চাচি, মামি, ফুপুদের অবস্থাটা প্রায় এক রকমই। সে দেখেছে কিছুদিন পরপর তারা যখন একসঙ্গে বসার সুযোগ পান, গল্পের ব্যাগটা উপুড় করে দিয়েই যেন বসে। কারো

কথাই শেষ হতে চায় না তখন। এখানে এখন এ অবস্থাটাই চলছে। তানিয়া লক্ষ করলো, মেজো খালাম্মা বলছেন, তার এক জা-য়ের একটি ঘটনা, সেটা শুনে সবাই হাসছে। চায়না খালাম্মা তাদের পাশের বাসার এক মহিলার সাজ-গোজ নিয়ে মজার মজার কথা বলছেন। খালাম্মাদের বয়সী রাজিয়া আপা হেসে তো কুটি-কুটি। তিনি বলছেন : খালারা! তোমরা বলে যাও। আমার কাছে এর চেয়েও ভালো স্টক আছে গল্পের।

গল্পে গল্পে তানিয়ারও খুব মজা লাগছিলো। তার মনের চাপ ও ব্যস্ততার কথা সে বেমালুম ভুলতেই বসছিলো। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই মেঝো খালাম্মা তার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন : কিরে, তুই এখানে কেন? পড়ার টেবিলে যা। গল্প শোনার দরকার নেই তোর।

তানিয়া খাট থেকে অনেকটা গুমরা মুখেই উঠে দাঁড়ালো। আবার তাকে পড়তে বসতে হবে। আজকের মতো ব্যাপারটি তার জন্য মহা বিরক্তিকর লাগছে। তবুও কিছুই করার নেই। পড়তে বসতেই হবে। এখন কেউ মনোযোগ দিতে না পারলেও রাত আটটা পার হয়ে গেলেই বড়রা সবাই জিজ্ঞাসা করবে– 'পড়া কতোটা মুখস্থ হয়েছে।' হঠাৎ তানিয়ার একটি কথা মনে হয়ে গেলো। সে বললো : আচ্ছা! খালামনিরা! একটা কথা বলি? তোমরা যে কাল রাতে বই থেকে সুন্দর একটি হাদীস শুনেছিলে, কই আজ তো হাদীসটাকে তোমরাই মানছো না?

: তোর এতো পাকামি করতে হবে না। কোন হাদীসটার কথা তুই বলছিস? আমরা কী করছি? ছোট খালাম্মা চোখ-মুখ পাকিয়েই তাকে কথাটা বললেন।

তানিয়া গম্ভীর হয় বললো : তোমরাই তো হাদীসের কথাটা আমাদের বলেছো। ঐ যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি জানো, গীবত কাকে বলে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন : তোমার ভাইয়ের এমন কিছু তার অগোচরে আলোচনা করা, যা সে খারাপ মনে করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমি যে দোষের কথাটি বলছি, এটা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থেকে থাকে? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তরে বললেন, তার মধ্যে এ দোষটি থাকলেই তো বলা হবে যে, তুমি তার গীবত করেছো। আর এটা যদি তার মধ্যে আদৌ না থাকে তাহলে তো তুমি তার ওপর অপবাদ দিলে।'[৭]

: তো আমরা কী করছি। তুই কী বলতে চাচ্ছিস?' ছোট খালাম্মা জিজ্ঞাসা করলেন।

: তানিয়া বললো : এই যে তোমরা বিভিন্নজনের আলোচনা করছো, এগুলো শুনলে তারা কি ভালো মনে করবে? আমার তো তা মনে হয় না। এটাই তো তাহলে গীবত হয়ে যায়। গীবত করা তো আমরা শুনেছি– মারাত্মক গুনাহ। তানিয়ার কথা শেষ হওয়ার পর তানিয়া হেঁটে টেবিলের সামনে এসে বসে পড়লো। বই উল্টাতে লাগলো আবার। তানিয়া টের পাচ্ছে, ছোট খালাম্মা ক্ষেপে গেছেন খুবই। অন্যরা অবশ্য মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন তানিয়া কথা বলার সময়। ছোট খালাম্মা বললেন : 'যা পাকা হয়েছিস না তুই!'

তানিয়া আর কোনো কথাই বলছে না এখন। চুপচাপ বসে আছে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে। আসলে হাদীসের কথাটা এখন

তার মনে পড়ে গেছে বলেই সে বলেছে। বড়দেরকে জব্দ করার কোনো ইচ্ছা তার ছিলো না। কিন্তু খালাম্মার কথা-বার্তায় বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা একটু উল্টা-পাল্টা হয়ে গেছে। যাই হোক, এখন তো আর কিছু করার নেই। তানিয়া পড়ার মধ্যেই ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তার সম্ভবত কপালটাই আজ খারাপ। যতটুকু সম্ভাবনা ছিলো, ছোট খালাম্মা পড়া কিছুটা বুঝিয়ে দেবেন, এখন সেটুকুও শেষ হয়ে গেলো। কাল তার পরীক্ষা কি খারাপ হবে?

তানিয়া চোখ না ফিরিয়েই লক্ষ করছে, এখন খালাম্মা-আপাদের গল্প বন্ধ। মেজো খালাম্মা হঠাৎ বললেন : এই চল্ উঠি। এশার নামাযের আযান হচ্ছে। নামাযটা পড়ে ফেলি। তানিয়ার পড়াটা তুই একটু দেখিয়ে দিবি তামান্না, নামাযের পর। তানিয়া তো আসলে ভুল কিছু বলেনি। ও তো ঠিকই বলেছে। ওর ওপর রাগ না করে খুশি হওয়াই বরং আমাদের উচিত।

মেজো খালাম্মার মুখের কথাগুলো তানিয়ার বুকের ভার একেবারেই হালকা করে দিলো। তানিয়ার মনটা ঝরঝরা হয়ে গেলো নিমিষেই।

নাসরিন খালাম্মা বললেন : আসলে আমরা গুনাহের মতো একটা কাজেও মাঝে-মধ্যে খুব মজা পেয়ে যাই। মিষ্টি বিষের মতো। তখন তার বিরুদ্ধে কথা শুনলে মেজাজটাই বিগড়ে যায়। বুঝতে চাই না। এটা অবশ্য প্রায় সবারই সমস্যা। নাসরিন খালাম্মার কথা শেষ হতেই রাজিয়া আপা বললেন : যাক আজ আমাদের তানিয়া দরবেশেরই বিজয় হলো। ও আসলেই সতর্ক করেছে আমাদের।

তানিয়া সবার কথা শুনছিলো। এখন ওর কিছুটা লজ্জাই করতে লাগলো। ছোট খালাম্মা খাট থেকে উঠে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : দেখি তো কোন্ বইটা নিয়ে বসেছিস। মহল্লার মসজিদের মাইকে তখন আযানের শেষ ধ্বনিটা উচ্চারিত হচ্ছে। ⊙

ছোঁয়া

সন্ধ্যার পর পরই ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেলো।

সুমন এখনও বাসায় ফিরে আসেনি। সুমনের আব্বা আবুল কালাম সাহেব মোড়ে গিয়ে ঘুরে এসেছেন দু'বার। সুমন তার বখে যাওয়া বন্ধুদের কারো কারো সাথে বসে মাঝে মাঝে আড্ডা মারে যে চায়ের দোকানটায়, সেটার সামনে দিয়েও একবার ঘুরে এসেছেন। সুমন মোড়ের দিকে কোথাও নেই।

সুমনদের বাসায় উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা সবার মাঝে। আসরের নামাযের পর সুমনের আম্মাকে প্রেসারের ট্যাবলেট খাওয়াতে হয়েছে। তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন তখন থেকেই। খবরটা পাওয়ার পর সুমনের ভাইয়া আসিফ ইউনিভার্সিটি থেকে এসেই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সম্ভাব্য নানান জায়গায় সুমনের খোঁজে ঢুঁ মারতে হবে তাকে।

দু'মাস পর সুমনের এসএসসি পরীক্ষা। সুমন ছাত্র হিসেবে ভালো। আচার-আচরণ ও চলাফেরাতেও তেমন কোনো সমস্যা নেই সুমনের। কিন্তু ওর একটি ব্যাপার নিয়ে পরিবারের সবারই দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সেটি হচ্ছে, পাশের কলোনির কয়েকটি

বাজে ছেলের সাথে ওকে সকাল-বিকাল ঘুরতে দেখা যায়। বসে বসে গল্প করতে দেখা যায়। ছেলেগুলির ওপর মহল্লার অনেকেই বিরক্ত। এ বিষয়টি-ই সন্দেহজনক। সুমনকে বহু বুঝিয়েও ওই ছেলেদের খপ্পর থেকে ছাড়ানো যায়নি।

মহল্লার বন্ধুদের ব্যাপারে সুমনকে কিছু বললে সে প্রায়ই নীরব হয়ে থাকে। কখনো কখনো না শোনার ভান করে। যেন তার সাথে তার আব্বা কিংবা আম্মা অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলে তার গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করছেন। ভাইয়া মাঝে মাঝে সুমনকে সামনে পেয়ে বিষয়টি নিয়ে চিৎকার করে কিছু বললে সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দেয় : 'আমার কীভাবে চলতে হবে সেটা আমি জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই।' সুমনের এই আচরণটাই পরিবারের সবাইকে ভয় ও সংশয়ে ফেলে দিয়েছে।

আজ দুপুরে মোড়ে গিয়ে আবুল কালাম সাহেব খবর পেলেন, সুমনের সেই বখে যাওয়া বন্ধুদের একজন–হাসমতকে ছিনতাইয়ের মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। পুলিশ এসে মোড়ে আরো দু-একজনকে গ্রেফতার করার জন্য ঘুরে গেছে। সুমনের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার শুরু তখন থেকেই। তারপর তিনটার সময় স্কুল থেকে ফিরে আসার কথা থাকলেও যখন সুমন আসেনি এবং সন্ধ্যাও পার হয়ে গেছে, তখন দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মাত্রা চূড়ায় পৌঁছেছে।

ইলেক্ট্রিসিটি আসার পর আবুল কালাম সাহেব পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে ফোন করলেন সুমনের খিলগাঁয়ের খালার বাসায়। সেখানেও যায়নি সুমন। তাহলে গেলো কোথায় সে? ধীর-স্থির মানুষ আবুল কালাম সাহেব। তারও মনে হচ্ছে, এখন মাথাটায় একটু পানি

ঢেলে নিলে ভালো হতো। মাথাটা গরম হয়ে গেছে। বাসায় এসে দেখলেন, আসিফ অনেকটা উদ্ভ্রান্তের মতো বসে আছে বসার ঘরে। আব্বাকে দেখেই আসিফ বললো : সম্ভাব্য সব জায়গায় ঘুরে এলাম। কিন্তু পেলাম না কোথাও।

: আমিও তো চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারছি না, ওকেও কি ধরে নিয়ে গেলো নাকি। ছেলেটা কতোটা ভালো আছে অথবা খারাপ হয়ে গেছে, এখন তো সেটাও বুঝতে পারছি না।' আবুল কালাম সাহেবের কথায় ছড়িয়ে পড়লো গভীর দুঃখ ও হতাশা।

: থানায় গিয়ে খবর দেওয়ার সুযোগ তো নেই। এখনতো বাজে আটটা। আমরা আরো ঘণ্টা খানেক দেখি। তারপর আব্বা! থানায় গিয়েও দেখে আসবো।' আসিফ বললো।

পিতা-পুত্রের কথাবার্তার মধ্যেই সুমনের আম্মা এই ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে পা ফেলে এসে তিনি সোফায় আসিফের পাশে বসলেন। তার দিকে লক্ষ করছে বড় ছেলে আর তার স্বামী। তিনি বললেন ধীর ও স্থির কণ্ঠে : তোমাদের কথা আমি ওই ঘর থেকেই শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে, সুমনের কিছু হয়নি। তোমরা দুশ্চিন্তা করো না। একটু অপেক্ষা করো। দেখি আল্লাহ কী করেন।' সুমনের আম্মার কথা শেষ হতেই কলিং বেল বেজে ওঠলো। আসিফ এক দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখলো, দরজার সামনে সুমন দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা, চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে। সে একেবারেই বিধ্বস্ত। আসিফ সরে দাঁড়ালো দরজার সামনে থেকে। সুমন ঘরে ঢুকেই বললো : আম্মা ভাত খাবো।

'তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ। ওই বাদমাশ ছেলেগুলির সঙ্গে তোর কী? তুই কি আমাদেরকে মেরে ফেলবি নাকি?' একটানে

কথাগুলো বলেই সুমনের আম্মা কেঁদে ফেললেন। সুমন দেখলো রাগী চোখে তার দিকে আব্বা আর ভাইয়াও তাকিয়ে আছে। সুমন বুঝতে পারছে না কিছুই। বাসায় ফিরতে দেরি হয়েছে। তারতো কারণও আছে। সেটা তো সে বলবেই। কিন্তু সবাই এভাবে ক্ষেপে আছে কেন?

'কী হয়েছে? তোমরা এভাবে কথা বলছো কেন? আমি কী করলাম? কোন্ ছেলেদের কথা বলছো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার তো ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।' সুমন বললো।

'এতো দেরি হলো কেন তোর বাসায় আসতে। মহল্লায় তোর বন্ধুদের কী হয়েছে জানিস?' ভাইয়া চিৎকার করে বললেন। সুমন অবাক হয়ে বললো : কার কী হয়েছে, আমি তো কিছুই জানি না। আমাদের ক্লাসেরই ছাত্র আদনান ক্লাসে দুটার দিকে হঠাৎ করেই এপেন্ডিক্সের ব্যথায় বেহুঁশ হয়ে গেলো। আমরা চারজন এক স্যারের সঙ্গে তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। আদনানের বাসায় খবর দিতে হলো। সন্ধ্যার পর অপারেশন হলো। আমি তো সেখানেই ছিলাম। তোমরা স্কুলে খবর নিতে গেলেও তো জানতে পারতে।'

সুমনের কথা শুনেই তার আম্মা বুয়াকে বললেন তাড়াতাড়ি খাবার রেডি করার জন্য। আবুল কালাম সাহেব বললেন : ও! তুই হাসপাতালে ছিলি? এখন তোদের সেই ক্লাসমেটের অবস্থা কী?

সুমন বললো :' এখন ভালো। সপ্তাহখানেক মনে হয় হাসপাতালে থাকতে হবে তাকে। কিন্তু মহল্লায় বন্ধুদের কী হয়েছে বললে, বুঝতে পারছি না।'

ভাইয়া বললো : 'তোদের আড্ডার ওই হাসমতকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। পুলিশ এসে আরো খোঁজাখুঁজি করছে মোড়ে। তুই কিছুই জানিস না?'

'না, আমি তো জানতাম না এসব। ওদের হাব-ভাবেই আমি অবশ্য অনুমান করেছিলাম এরকম কিছু হবে। এতে আমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তার কী আছে ! আমি কি ওদের সঙ্গে অকাজ-কুকাজে যাই নাকি?'

: তুই তো ওদের সঙ্গে মিশিশ্। বন্ধুর মতো চলিস্ আর আড্ডা মেরেও সময় কাটাস?' ভাইয়া বললো রাগত স্বরে।

: ওরা আমার বন্ধু নয়। চলি, গল্পও করি। কিন্তু ওদের সব কাজেই তো থাকি না। এটা কি দোষ আমার?' অভিমানী ও কাঁদো কাঁদো স্বরে সুমন বললো।

সুমনের আব্বা এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বলেননি এ বিষয়ে। চুপচাপ শুনছিলেন সব। এবার মুখ খুললেন : এটা তোর দোষ নয় হয়তো। কিন্তু এটার কারণে তুই-ও একদিন দোষী হয়ে যেতে পারিস। খারাপ ছেলেদের সাথে বন্ধুদের মতো চলতে, বন্ধু বানাতে এজন্যই সব সময় আমরা নিষেধ করি তোদের। তোরা বুঝতে চাস্ না।'



সুমন ভেতরে ভেতরে কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। কারণ সে তো জানে, ছেলেগুলো আসলেই বাজে। ওদের বখামিপনা সুমনেরও ভালো লাগে না। কিন্তু মহল্লায় চলতে গেলে একদম কথাবার্তা বন্ধ রেখেতো চলা যায় না। সুমন তো কেবল সেটুকুই করে। এর চেয়ে বেশি তো কিছু নয়। তাই সে এবার বেশ ঝাঁঝাঁলো স্বরেই বললো : বন্ধুর মতো চললেই কী? আমি নিজে তো খারাপ কিছু করছি না।'

সুমনের আব্বা আবারো বললেন : শোন্! আজ আমাদের নবীজীর একটি কথা তোকে বলি। তাঁর কোনো কথাই মিথ্যা হতে পারে না। তিনি বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর জীবনাচার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন দেখে নেয় যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।[৮]

'এই কথাটি অনেক বড় একটি কথা। এই একটি কথার দিকে লক্ষ করে হলেও তোর নিজেকে বন্ধু নির্বাচনে একটু সংযত কর তুই। তোর তো সবই ঠিক আছে। আমরা তো খুশি তোর ওপর। হাসপাতালের ব্যাপারে যা বললি, যা করলি, সবই বড় কাজ। শুধু আমাদের একটি খবর ফোনে দিয়ে দিলে ভালো করতি।

সুমনের মাথা নিচু হয়ে এলো। এখন ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছে সে। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললো : ঠিক আছে। ওদের সাথে আর দেখবে না আমাকে। এখন তো পরীক্ষা আমার মাথার ওপর।

আম্মা বললেন : তাড়াতাড়ি খেতে বোস্। তোর শরীরটা তো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ⊙

অবাক স্বীকারোক্তি

ক্লাসের সব ছাত্রই নীরব।

এভাবে ক্লাসের শেষে আগে কখনো বিচার বসেনি। আজ হেডস্যার সবাইকে বসতে বলেছেন ক্লাসেই। তারপর তিনি কবির আর জামানকে ডেকেছেন সামনে। তারা দু'জনই এই ক্লাস-এইটেরই ছাত্র। তাদের একজন–জামান স্যারের কাছে অভিযোগ করেছে যে, কবির তার ড্রয়িংখাতা আর ইংলিশ নোটবুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। সে ছেঁড়া খাতা ও বইয়ের কিছু কিছু টুকরোও স্যারকে গিয়ে দেখিয়েছে। আজ বিচারটি বসেছে মূলত এজন্যই।

কবির অবশ্য অভিযোগের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়েছে। সে একদম কাঁদো কাঁদো সুরেই স্যারকে লাইব্রেরিরুমে গিয়ে জানিয়ে এসেছিলো, এমন কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়। সে এত খারাপ কাজ আগেও করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। স্যার তখনই বলেছেন : বিচার তোদের ক্লাসেই হবে। এখন যা। স্যারের কাছ থেকে ফিরে এসে কবির ক্লাসরুমে বসে কিছুক্ষণ কেঁদেছে। তারপর জামান এসে জানিয়েছিলো : 'সবাইকে বসতে হবে। ক্লাস শেষ হওয়ার

পর স্যার আসবেন।' সেটা নিয়ে গোটা ক্লাসেই একটা ভীতি ও মন খারাপ করা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে আছে। কারণ কবির আর জামান দু'জনই ভালো ও ভদ্র ছাত্র। এখন এদের মধ্যে যে কে লজ্জা পেয়ে যায়, এটা নিয়েই যেন ক্লাসের ছাত্ররা আতঙ্কিত।

স্যার বললেন : তোমাদের সামনে যে দু'জন দাঁড়নো আছে, এদের প্রত্যেকের কথা শুনে, চেহারা দেখে আমার মনে হয়েছে, সে যা বলেছে সত্য বলেছে। অপরজনই অপরাধী। কিন্তু সেটা তো হতে পারে না। তাই আমি নিয়ত করেছি, তোমাদের সামনে একটি হাদীস পড়বো এবং বিচারের দায়িত্ব এদের হাতেই ছেড়ে দেবো। তোমরা কি হাদীসটি শুনবে?

: জ্বী স্যার, জ্বী স্যার! সব ছাত্রই সমস্বরে বলে উঠলো। শুধু কবির আর জামানের মুখ মাটির দিকে ফিরে রয়েছে। স্যার বললেন : নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার তাঁর কামরার দরজার কাছে ঝগড়ার আওয়াজ শুনলেন। তিনি তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন : 'আমি তো একজন মানুষই। আমার কাছে বিচারপ্রার্থীরা আসে। তখন হতে পারে, তোমাদের কেউ অন্যজনের চেয়ে বেশি গুছিয়ে কথা বলবে আর আমি মনে করতে পারি যে, সে সত্য কথাই বলেছে এবং সে অনুযায়ী রায়ও দিয়ে দিতে পারি। তাই আমি যাকে কোনো মুসলমানের হক্ব (অধিকার) দিয়ে দিই, সেটা হবে তার জন্য আগুনের টুকরো। তারপর সে এটা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে দিক।'[৯]

স্যার এবার বললেন : আমিও বলছি আগুনের টুকরো নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে মিথ্যা যে বলেছো, সে বলে যাও। বিচারে হয়তো জিতে যাবে। কিন্তু পরিণতি হবে ভয়াবহ।

স্যারের কথা শেষ হতেই কবির দাঁড়িয়ে বললো : স্যার আমাকে শাস্তি দিন। আমিই আসলে অপরাধী। কাল ও আমাকে নোট খাতা দিতে অস্বীকার করায় জেদে আমি এই কাজটি করেছি।

গোটা ক্লাস স্তম্ভিত হয়ে গেলো। কবিরের কান্না দেখে এর আগে তারা উল্টোটাই বুঝেছিলো। আবার এখন কবিরের স্বীকারোক্তিও তাদের অবাক করে দিলো। স্যার বললেন : এখন আমি খুশি। অপরাধ অন্যের কাঁধে না চাপিয়ে আগে নিজে স্বীকার করাই তো ভালো। আগুনের জন্য অপেক্ষা করা মস্ত বড় ভুল। কবির! আগামীকাল তুমি ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে আসবে। আর এখন জামানের কাছে মাফ চাও।'

পুরোনো আমলের দেয়াল ঘড়িতে তখন বিকাল চারটা বাজার ধ্বনি ভারি স্বরে বেজে উঠলো। ০

বৃষ্টিভেজা বিকেল

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে গত রাত থেকে। মাঝে-মধ্যে থামে আধা ঘণ্টার জন্য। আবার শুরু হয়। টানা দু'-তিন ঘণ্টা। কাজ-কাম না থাকলে এমন বৃষ্টিতে বড় কাজ, ধুমছে ঘুম দেওয়া। কিন্তু সে ভাগ্য আরিফের হয়নি।

বিশ্রামের মধ্যেই সে ছিলো। পরীক্ষার পরের ছুটি চলছে। একদম হাত পা ঝাড়া। এর মধ্যেই খবর এলো, একটু হাসপাতালে যেতে হবে তাকে। বাড়ি থেকে এক ফুপা এসে ভর্তি হয়েছেন। সঙ্গে লোকজন আছে। তাই আজ রাতের খাবার বাসা থেকে তাকেই নিয়ে যেতে হবে। এই শেষ দুপুরে আরিফের আম্মা টিফিন-ক্যারিয়ার তার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'ফেরার সময় তোর ফুপুকে সঙ্গে নিয়ে আসবি বাসায়'।

গলির মোড়েই দু'টি রিক্সা দাঁড়ানো। বাসা থেকেই এক দৌড়ে সে বের হলো। মোড়ে এমনিতেও রিক্সা পেতে অসুবিধা হয় না।

এখন এদিকে অন্য কোনো যাত্রীও নেই। রিক্সা পেতে তার সমস্যা হওয়ার কথাই ছিলো না। কিন্তু দু'জন রিক্সাওয়ালার অবস্থা একই রকম। কথাই বলতে চায় না তারা। ভাড়া নেবে, যাত্রীও তুলবে। কিন্তু অপ্রকাশ্য কোনো কারণে এখন আরিফের কথার উত্তর দিচ্ছে না কেউ-ই।

বৃষ্টির সময় রিক্সাওয়ালাদের এমন অবস্থা আগেও দেখেছে আরিফ। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো তার। ভিজে যাচ্ছে সে। আর মিনিট দশেক এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে তার কম্ম সারা। কাপড়-চোপড় ভিজে চপচপ করতে থাকবে। এরই মধ্যে পাশে এসে দাঁড়ালেন খলিল চাচা। মহল্লার চাচা। আরিফের আব্বার সঙ্গে ততো মেলামেশা নেই। মহল্লায় তাবলিগ জামাতের কাজে তিনি খুব ব্যস্ত থাকেন।



খলিল চাচাও কি কোথাও যাবেন না কি? তিনিও দেখা যাচ্ছে, রিক্সা খুঁজছেন। আরিফ তাকে একটু এড়িয়েই যেতে চাইলো। কিন্তু তিনি তাকে ছাড়লেন না। হেসে হেসে কথা বলে জেনে নিলেন, আরিফ কোথায় যাবে। তিনি বললেন, তাকেও হাসপাতালে যেতে হবে। জরুরি প্রয়োজন। মহল্লার এক তাবলীগি ভাইয়ের অপারেশন আজ।

এর মধ্যেই নতুন একটি রিক্সা চলে এলো। ভিজতে ভিজতে দু'জনই রিক্সায় উঠে পড়লো। এক সঙ্গে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই তারা হাসপাতালের সামনে পৌঁছে গেলো। ওখানে পৌঁছেই নতুন সমস্যা। কারো কাছে টাকা ভাংতি নেই। আরিফের কাছে নেই, খলিল চাচার কাছে নেই, রিক্সাওয়ালার কাছেও নেই। যুবক রিক্সাওয়ালা বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে আছে। দেখে মায়াই হয়। কিন্তু সে কথা বলছে সাংঘাতিক কড়া স্বরে- 'ভাংতি আপনারা দিবেন। টাকা ভাংগায়া বাইরাইতে পারেন না? বৃষ্টির মধ্যে ভাড়া মারছি। অহন টাকা ভাংতি কইরা দিতে হইব। পারমু না।'

রিক্সাওয়ালার কথা শুনে আরিফের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খলিল চাচা হাসছেন। আরিফকে একটি শেডের নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি সামনের দু'-তিনটি দোকান ঘুরলেন। টাকা ভাংতি করে হাসিমুখে রিক্সাওয়ালার হাতে ভাড়া তুলে দিলেন। তারপর বললেন, 'বাবা, তোমরা রাগ করো কেন? ভাংতি না থাকলে হাসিমুখে বলবা। চেষ্টা করে দেখবা। তোমরা না পারলে আমরা দেবো।'

রিক্সাওয়ালা তার কথার কোনো উত্তর না দিলেও কথাগুলো বলে তিনি হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন। যেন মহা-কৌতুকের কোনো

ব্যাপার ঘটে গেছে। আরিফ এই হাসির কোনো কারণই বুঝতে পারছে না।

রিক্সাওয়ালার ভাংতিপর্ব সেরে তারা যখন হাসপাতালের লম্বা বারান্দায় ছুটে চলছে, তখনই এক লোক তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। খলিল চাচাকে সে বললো- 'ভাই! আপনার কাছে পঞ্চাশ টাকার ভাংতি থাকলে দেন। আমি রিক্সা নিয়ে আটকে গেছি।' আরিফ তখন লোকটাকে বললো- 'সামনের ওই দোকানগুলোতে যান। ভাংতি পাবেন।'

কিন্তু আরিফকে থামিয়ে দিয়ে খলিল চাচা আবার হাসিমুখে বললেন- 'একটু দাঁড়ান! দেখি, ভাংতি আছে কি না?' এ কথা বলেই তিনি পকেট থেকে খুচরা টাকা বের করলেন। মিলিয়ে দেখলেন হয়ে যায় পঞ্চাশ টাকা। তিনি লোকটাকে ভাংতি দিয়ে দিলেন। খুশির সঙ্গে, বিরক্তিহীনভাবে। যেন এই লোককে ভাংতি দেওয়াই তার দায়িত্ব। এরপর আবার তারা হাঁটতে শুরু করলো হাসপাতালের লম্বা বারান্দায়। খলিল চাচা বললেন, 'আগে তোমাকে তোমার ফুপার ওয়ার্ডে পৌঁছে দিই। পরে আমি যাচ্ছি।' পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের সামনে তারা পৌঁছে গেলো। চলতে চলতে কয়েকবারই আরিফকে হাসিমুখে নামায পড়ার জন্য বিভিন্নভাবে বুঝালেন খলিল চাচা। আরিফ হু-হা করে কোনোরকম সম্মতি জানালো। তারপর ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বললো- 'চাচা! একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।'

খলিল চাচা বললেন- 'বলে ফেলো আরিফ! কোনো অসুবিধা নেই।' আবারও তিনি হাসিমুখ।

অল্প সময়ের মধ্যে মহল্লার এই চাচার সঙ্গে আপন হয়ে যাওয়ায় আরিফ যেন একটু সাহসী হয়ে ওঠলো। বললো, 'আপনি

সবসময়, এমনকি রাগের সময়ও হাসিমুখে কথা বলেন কেন? আর নিজের ব্যস্ততার সময়ও অন্যের উপকার করার চেষ্টা করেন কেন?'

আরিফের প্রশ্ন শুনে খলিল চাচা হেসে ফেলে বললেন- 'আরে পাগল! এতে তো দোষের কিছু নেই। এটা তো ভালো। সওয়াবের কাজ। তোমার দু'টি প্রশ্নের উত্তরে একটা হাদীস তোমাকে শোনাই। আমাদের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– 'তোমরা সদাচরণের কোনো কিছুকেই তুচ্ছ মনে করবে না। একটি সদাচরণ এটিও যে, তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে। আরেকটি সদাচরণ এটিও যে, তুমি তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ভরে দেবে।'[১০]

আরিফ বললো- 'এজন্যই আপনি সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন? আমি বুঝিনি।'

খলিল চাচা বললেন, 'আর বালতিতে পানি দেওয়ার ব্যপারটি হলো একটি উদাহরণ। এর মানে হলো, যে কোনো ছোটখাটো উপকার করলেও অনেক সওয়াব।'

আরিফ বললো- 'বুঝেছি, আপনি নিজের করা খুচরো টাকা আরেকজনকে এজন্যই ভাংতি হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন।'

আরিফের কথায় খলিল চাচা হেসে বললেন- 'তুমি এখন তোমার রোগী দেখতে যাও। মাগরিবের পর আমি এদিকে আসবো। তোমার কোনো দরকার হলে দোতলার শেষ মাথার ওয়ার্ডে যেয়ো। আমাকে পাবে।'

আরিফ ওয়ার্ডের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলো, এই শেষ বিকেলে বৃষ্টি থেমে হালকা রোদ হেসে ওঠেছে। ওয়ার্ডের ভেতরে শেষ জানালাটির কাছে তার ফুপা শুয়ে আছেন। খাটের উল্টো দিক ফিরে বসে আছেন ফুফু। সে দিকেই সে এগিয়ে গেলো। মেজাজ তার প্রচণ্ড খারাপ ছিলো। কিন্তু সে এগিয়ে যাচ্ছে হাসিমুখে। পথের ধকলের কারণে বিরক্তির কোনো ছাপ যেন না পড়ে তার চেহারায়- সে চেষ্টাই সে করে যাচ্ছে। ফুপা-ফুপুর সঙ্গে হেসে হেসে তাকে কথা বলতে হবে। আজ সে জানলো, হাসিমুখে কথা বলাও একটি বড় সওয়াব। ⊙

সকালের মিষ্টি রোদ

রফিকের ঘুম ভাঙলো ফজরের আযান শোনে।

ঘুম থেকে ওঠার পর অল্প কিছুক্ষণ সে ঝিম মেরে রইল। শরীরে এখনও তার ক্লান্তির রেশ রয়ে গেছে। চোখ রগড়ে উঠে বসতেই সে অনুমান করলো, তার থাকার বিছানা ও ঘরটি তার পরিচিত নয়। তখনই মনে পড়ে গেলো, গতকাল রাতে সে এখানে এসে উঠেছে। এটি মসজিদের পাশের একটি কামরা। ইমাম সাহেবের জন্য বানানো এই কামরাটিতে রাতে তাকে থাকতে দিয়েছেন ইমাম সাহেব। তিনি থাকেন কাছেই তার বাসায়।

ফজরের নামায শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব তার মুসল্লায় বসেই রফিককে ডাকলেন। সামনেই বসা ছিল রফিক। সে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে বসলো। এই গ্রামের মুসল্লীরা যারা এসেছিলেন নামাযে, তারা একে একে চলে যাচ্ছেন। দু' একজন বসেও আছেন ইমাম সাহেবের সামনে। ইমাম সাহেব রফিককে

বললেন : ঘুম কেমন হয়েছে তোমার? কোনো অসুবিধা হয়নি তো? রফিক হেসে ফেলে বললো : 'এক ঘুমেই রাত পার হয়ে গেছে। সমস্যা হয়নি।'

ইমাম সাহেব রফিককে নিয়ে মসজিদ থেকে বের হলেন। তিনি নাস্তা খাওয়ানোর জন্য রফিককে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন। মসজিদের সামনে ছোট বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা শীতের কাপড় জড়িয়ে একজন-দু'জন করে জমা হচ্ছে। তারা ইমাম সাহেবের কাছে পড়বে। তাদেরকে আধাপাকা এই মসজিদের বারান্দায় চট বিছিয়ে বসতে বলে ইমাম সাহেব হাঁটতে লাগলেন। রফিকও তাঁর সাথে সাথে হাঁটছে।

রফিক সদ্য এইচএসসি পাশ করা এক তরুণ। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ক্লাস এখনও শুরু হয়নি তার। মেধাবী ছাত্র রফিক পারিবারিক পরিবেশের কারণেই কিছুটা ধার্মিক স্বভাবের ছেলে। তারপরও কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার মাত্রা তার মাঝে দেখা যায় এতো বেশি যে, মাঝে মাঝে মনে হতে থাকে, এই ছেলের ভেতরে হয়তো কোনো জেদ কিংবা একগুঁয়েমির ভাব রয়েছে। সেই রফিকই আচরণ ও কথাবার্তায় এমনিতে আবার অসামান্য ভদ্রও। মফস্বলের এই মসজিদে এসে রাত কাটানোর কোনো কথা ছিলো না তার। পরশু দুপুরে সে গিয়েছিলো তার খালাম্মার বাড়িতে। সেখানে যেতে হয়েছিলো আম্মার হুকুমে এবং নিজের কিছুটা সখ ছিলো, সেই কারণে। খালাম্মার বাড়ি এখান থেকে আরো দশ মাইল ভেতরে। একদম অজপাড়াগাঁয়ে। হেঁটে হেঁটে ফেরার পথে এই বাজারে সন্ধ্যা পার হয়ে যায় গতকাল। শীতও নেমেছিলো ভীষণ। এখানে কোথাও থেকে যাওয়া ছাড়া তার সামনে কোনো পথ খোলা ছিলো না তখন। এশার নামাযের সময়

যখন সে ইমাম সাহেবকে সব খুলে বললো তখন ইমাম সাহেব তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এখানে। রফিকের মাথা থেকে তখন শীতের রাতে রাত কাটানোর দুশ্চিন্তার ভার নেমে গিয়েছিলো। তার মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিলো।

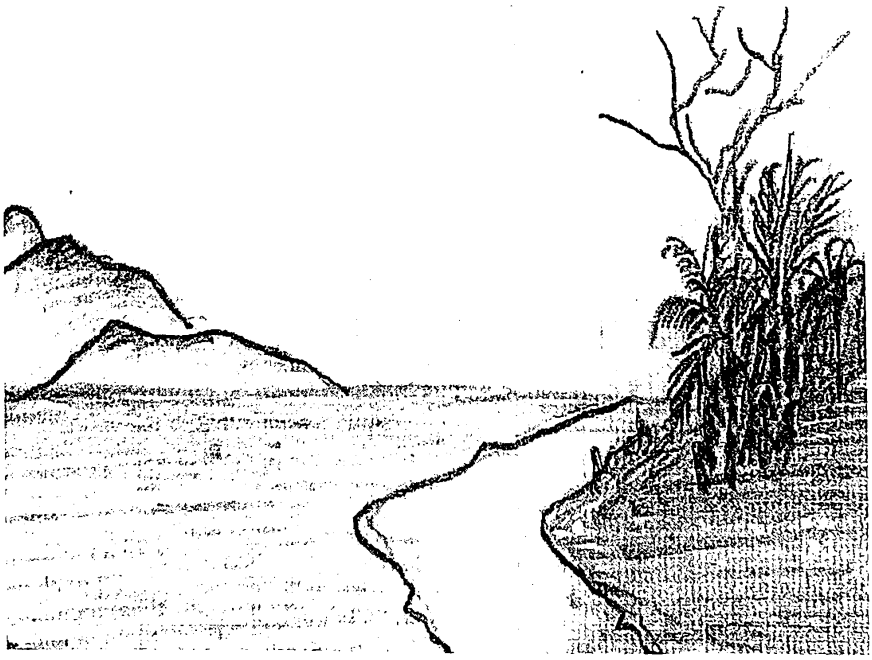
আকাশে এখন কোমল রোদ। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে চারদিক থেকে। ইমাম সাহেবের বাড়ির সামনে বারান্দায় পেতে রাখা বাঁশের একটি চৌকিতে রফিক বসে আছে। ইমাম সাহেব নাস্তা আনতে ভেতরে চলে গেছেন। রফিক বারান্দায় বসে বসে শীতের সকালে গ্রাম দেখছিলো। দেখছিলো, ইমাম সাহেবের বাড়ির সামনের সব্জিক্ষেত, নতুন লাগানো কিছু গাছের চারা, খোলা উঠান থেকেই হাঁস-মুরগির ছানাগুলোর খুঁটে খুঁটে খাওয়ার দৃশ্য।

ইমাম সাহেব নাস্তা নিয়ে বাইরে এলেন। তার সঙ্গে ছোট একটি ছেলে পানির জগ-গ্লাস নিয়ে এলো। ইমাম সাহেবের এই আপ্যায়নে রফিক মুগ্ধ হয়ে গেলো। সে তো নামাযের পর পরই চলে যেতে চেয়েছিলো। গতরাতেই কথা হয়েছে। কিন্তু ইমাম সাহেব সামান্য নাস্তা না খাইয়ে তাকে যেতে দেবেন না। কারণ এখানকার স্থানীয় লোক সে নয় এবং সে চলে যাবে শহরে। তাই তাকে নাস্তা খেয়েই যেতে হবে। এটাই ছিলো ইমাম সাহেবের যুক্তি। গতরাতে অবশ্য আরো কিছু কথাবার্তা রফিক আর ইমাম সাহেবের মাঝে হয়েছিলো, তখন সে শুনেছে– ইমাম সাহেব শহরেরই মানুষ। এ গ্রামে তিনি এসেছেন ধর্ম ও দ্বীনের কিছু কাজে। মানুষের মাঝে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার, মানুষের মাঝে সুন্দর চেতনা ও সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছায়।

রফিকের মনে হয়েছে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দের পথ ছেড়ে এই গ্রামে চলে আসাটা ইমাম সাহেবের ঠিক হয়নি। দুনিয়ার যতো সুযোগ-

সুবিধা, তার অধিকাংশই কিছু পাপী বড়লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে এঁরা কেন গুটিয়ে নেন নিজেদেরকে– এই প্রশ্নটা রফিকের মনে ঘুরতে শুরু করেছিলো। সে বলেছেও ইমাম সাহেবকে তার প্রশ্নের কথাটি। ইমাম সাহেব হেসে ফেলেছিলেন তার কথা শুনে। শুধু বলেছিলেন : তোমার ভেতরে তো দেখা যায় বেশ রাগ আর প্রশ্ন রয়েছে। ঠিক আছে, সকালে কথা হবে।'

নাস্তা শেষ করতেই ইমাম সাহেব বললেন : তুমি কাল রাতে একটি বিষয়ে কথা বলছিলে। তার সব উত্তর ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয় এখন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা যেটা বলেছো, তার একটি উত্তর হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে অল্প রিযিক পেয়ে তুষ্ট হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে অল্প আমলেই খুশি হয়ে যান।[১১]



ইমাম সাহেব আরো বললেন : অল্প রিযিক নিয়ে তুষ্ট হওয়ার ফলে যদি আল্লাহকে খুশি করা যায় অল্প আমল দিয়েই, তাহলে সে সুযোগটা নষ্ট করবো কেন? আমরা গুণাহ্গার বান্দা। দীর্ঘ হিসাব দিয়ে তো আখেরাতে পার পাবো না।

রফিক ইমাম সাহেবের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলো। এভাবে কেউ নিজের জীবন, নিজের সংসারের জীবন নিয়ে চিন্তা করতে পারে, সে আগে ভাবেনি। সে বললো : 'দুনিয়ার পাপী লোকেরাই তাহলে ভালো মানুষদের ওপর ছড়ি ঘুরাবে? তারাই সব সুখ করে যাবে? গরীব ধার্মিকরা শুধু চেয়ে চেয়ে তাদের দেখবে?' রফিকের কৌতূহলী আর জিজ্ঞাসু মগজ ও হৃদয় যেন জাগ্রত হয়ে উঠলো প্রচণ্ডভাবে।

ইমাম সাহেব আবারো হাসলেন। তারপর বললেন : দেখ বাবা! যে বিষয়টা নিয়ে তুমি বলছো, এর অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। ব্যাখ্যা আছে।। সব বলা এখন সম্ভব নয়। পাপী বড়লোকদের সুখ-প্রাচুর্য তো কোনো ঈর্ষণীয় বিষয় হতে পারে না মুসলমানদের জন্য। চেয়ে চেয়ে দেখার কী আছে তাতে? এটাকে আক্ষেপের বিষয় বানালেই তো আক্ষেপের বিষয় হয়ে যায়। তা না হলে তো সেটা কিছুই না। আমাদের নবীজী কত সুন্দর বলেছেন : তুমি কোনো পাপাচারী ব্যক্তির প্রাচুর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ো না। কারণ তুমি জানো না, তার মৃত্যুর পর কেমন বিপদ তার সাথে সাক্ষাৎ করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তার জন্য এমন ঘাতক রয়েছে, যার মৃত্যু নেই।[১২]

ইমাম সাহেব অদ্ভুত প্রশান্ত স্বরে বললেন : দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী প্রাচুর্য আর সুবিধার দিকে তাকিয়ে আমরা দুর্বল হয়ে যাই। অথচ

সেটা তো প্রতিযোগিতা আর ঈর্ষার কোনো ব্যাপারই হতে পারে না। যাই হোক, তুমি যদি প্রথম বাস ধরতে চাও, তাহলে এক্ষুণি উঠে পড়তে হবে।

নানান বিষয়ে কৌতূহলী মেধাবী তরুণ রফিকের মনে হলো, তার অন্তরে যেন নতুন একটি সুখের আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। তার হৃদয়ের নরম যমীনে নেমে এসেছে সকালের মিষ্টি রোদ। সে আর দেরি করলো না। ইমাম সাহেবকে সালাম দিয়ে বিদায় নিলো। বাসায় পৌঁছে আজ বিকালেই আবার তাকে ঢাকায় রওয়ানা দিতে হবে। ⊙

আলোর মুখের ছবি

গল্পে ইতিহাসপাঠ।
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
(রহ.)-এর আরবি কিশোর রচনা
আল ক্বিরাআতুর রাশিদার 'মিনান নুজুমি
ইলাল আরদি'-এর ছায়া অবলম্বনে

এক

নাহ্! আর পারছি না। এভাবে কি রাত পার করে দেয়া সম্ভব! ঘুমে ঘুমে দু'চোখ বুজে আসছে। বইটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার আগেই রেখে দিলাম। ইতিহাসের বই-ই আমার প্রিয় সঙ্গী। আমার নির্জন অবসরের ভালো-লাগা বন্ধু। বিশেষত রাতে ঘুমাবার আগে। বালিশে মাথা রাখতেই হাতে উঠে আসবে বই। গভীর তন্ময়তায় যখন ইতিহাস পড়ি তখন উন্মীলিত দৃষ্টিপথে 'অতীত' জীবন্ত হয়ে উঠে। নিমিষেই বর্তমান থেকে আমি ছিটকে পড়ি সুদূর অতীতের হারানো রাজ্যে। হারানো বহু রঙিন কাহিনীর মাঝে। তখন যেন দিব্য চোখে দেখতে পাই অতীতের চরিত্রগুলো। মনে হতে থাকে, এ মুহূর্তে আবার ঘটে চলেছে সব ঘটনা-দুর্ঘটনা একে একে নতুন করে। যেন ঘটে চলেছে সব দ্রুত ঘূর্ণায়মান রিলের মতো একান্ত আমার জন্যই। আর আমি তা উপভোগ করছি দু'চোখ মেলে।

আম্মার বকুনিতে এই নিখাদ তন্ময়তায় যখন ছেদ পড়ে, আমি চমকে উঠি। ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যায় সব কিছু। যে বর্তমান–এর প্রতি প্রচণ্ড অনীহা আমার এই কৌতূহলী কৈশোরে, দেখি; সেটাই সত্য। ভাবি–ইস্! আমার জন্মটা যদি হতো আরো আগে, ইতিহাসের ঠিক যাত্রালগ্নে কিংবা তারও আগে এবং বেঁচে থাকতে পারতাম বহুকাল পর্যন্ত; শতাব্দী থেকে শতাব্দীকালের অগণিত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার এক মহাদর্শক হতে পারতাম! তাহলে ইতিহাসের এক বেদনাবিদ্ধ পাঠকের হৃদয় নিয়ে আমাকে

আজ কাতরাতে হতো না। বন্যার বাড়ন্ত পানির মতো আগুনতি আক্ষেপ আমার হৃদয়ের সবকূল ভাসিয়ে নিয়ে যেতো না। ভেবে দেখলাম, পৃথিবীর অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা আর মহাঘটনা আমি হারিয়েছি। আমি হারিয়েছি নূহের তুফান, ইবরাহীমের অগ্নিপরীক্ষা, মূসার লাঠি আর ঈসার কুম বিইযনিল্লাহ্-র মতো কতো আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনাবলি। দেড় হাজার বছর আগে হারিয়েছি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ আর খেলাফতে রাশেদার স্বর্ণকাল। হারিয়েছি উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের সোনালি দিন আর কর্ডোভা-গ্রানাডার দুঃখময় দিন, জ্বালাময় অতীত।

এইসব হারানোর বুকভরা বেদনা নিয়ে আমি নিশাচরের মতো রাত জাগি। ঘুমের কোমল হাতছানি উপেক্ষা করি আর ভাবি, আচ্ছা এই হারিয়ে যাওয়া অতীতটা কি জীবন্ত বর্তমান হতে পারে না? আমার এ চোখের সামনে সব আগের যুগের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি কি ঘটতে পারে না? বিজ্ঞানের যুগে কতো অসম্ভবই তো সম্ভব হচ্ছে। এটা হতে আর দোষ কি! সময় ও কালের সামনের চাকাটাকে পেছন থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা কি বিজ্ঞানের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? মধ্যরাতের বিছানায় আমার এই অবাস্তব কল্পনার মাঝপথে মনে পড়লো, ক'দিন আগের একটি ঘটনা। বিজ্ঞানের স্যারের সাথে আমার সামান্য কথাবার্তা হয়েছিলো। তিনি কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক-লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। সেই হিসাবে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। কেননা, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হলো প্রায় নয় কোটি বিশ লাখ মাইল। মহাশূন্যে এমনও বহু তারকা আছে, যার আলো পৃথিবীর মাটি ছুঁতে সময় লাগে হাজার-দু'হাজার বছর কিংবা তারও বেশি।

তাছাড়া এমন তারকা ও নক্ষত্রের সংখ্যাও কম নয়, যার আলো এখনও পৃথিবীর মাটি ছোঁয়নি।'

দুই

স্যারের এ কথায় কেন জানি আমার ভেতরে আবিষ্কার আর আনন্দের এক হিমেল স্রোত ওঠানামা করতে থাকে। সম্ভব-অসম্ভব পথ ধরে ভাবনা-চিন্তার মিছিল ছুটে চলে। স্যার আরো বলেছিলেন : বিভিন্ন জিনিসের উপর আলো পড়ে বলেই আমরা সেগুলো দেখতে পাই। অর্থাৎ দিনে সূর্যের আলো আর রাতে বাতির আলো আমাদের দৃষ্টিকে সচল রাখে।

আচ্ছা! সূর্যলোকে যদি কোনো প্রাণী থাকে তাহলে পৃথিবীর এই মুহূর্তের ঘটনাগুলো কি তারা আট মিনিট পরে দেখতে পাবে? কথাটা ভাবতেই হৃদয়ের পরতে পরতে যেন একটা শিহরণ বয়ে গেলো। ঝিম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। তারপর কতগুলো প্রশ্ন করলাম স্যারকে। সব শুনে এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তিনি তাকালেন, আমি ভড়কে গেলাম। স্যারের তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিলো, আমার উপর যেন নিউটনের আত্মা ভর করেছে। অনেকক্ষণ পরে শুধু বললেন : তা ভাবনাটা ঠিকই ভেবেছো, আমার ভড়কানো ভাবটা কেটে গেলো স্যারের এই কথায়। তাঁকে আবার প্রশ্ন করলাম– 'আচ্ছা স্যার! যেসব নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে আসতে লাগে হাজার দু'হাজার বছর কিংবা আরো বেশি, সেখানে যদি কোনো মানুষ পৌঁছুতে পারে তাহলে তার দৃষ্টিপথে পৃথিবীর অনেক অতীত ঘটনাও কি বর্তমান হয়ে ধরা দেবে না? আমার প্রশ্নে স্যারের মুখে মৃদু হাসির রেখা। তিনি মাথা

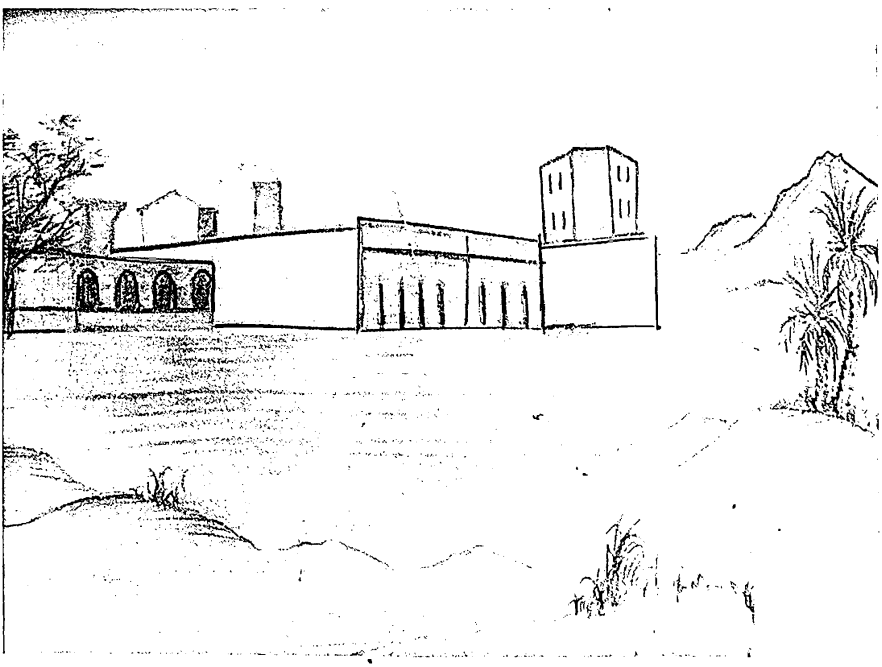
দুলিয়ে বললেন : এমন কি আরো দূরের কোনো তারকালোক থেকে তুমি পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারো। কোনো সমস্যা নেই। কেবল তোমার চোখের দৃষ্টিশক্তি পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে।

ক'দিন আগের সেই কথাগুলো মনে হওয়ায় আমার হৃদয়াকাশে খুশির একঝাঁক পায়রা যেন উড়াল দিলো এবং আবার তারা মুখ থুবড়ে পড়লো। গভীর রাতের নিস্তব্ধতায় হঠাৎ আম্মার স্নেহভরা ধমকের সুর ভেসে এলো : এখনো যে ঘুমুচ্ছো না তুমি? বাতি নিভিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমাও। সকালে ফজরের নামায পড়তে হবে না?' ঝটপট বেডসুইচ টিপ দিয়ে কাঁথার নিচে মুখ ঢাকলাম। ঘুম আমার দু'চোখে ভর করছে ভীষণভাবে। তারপরও আমি ভাবতে লাগলাম তারকালোকের বাসিন্দাদের কথা। কী জোর কপাল তাদের! এমন কপাল হলো না আমার। ভাবনার অতল সাগরে নাকি মহাশূন্যে হারিয়ে যাচ্ছি বলতে পারবো না। শুধু মনে হচ্ছে, নরম বিছানাটা আরো নরম, আরো কোমল হয়ে দোলনার মতো দোল খেয়ে উঠছে রকেটের গতিতে। আমি উড়ে চলেছি। কয়েক মুহূর্তেই মঙ্গল, নেপচুন ছাড়িয়ে গেলাম। আমার গলায় ঝুলানো বহু পাওয়ারের এক অত্যাধুনিক দূরবীক্ষণযন্ত্র। কোত্থেকে এটা গলায় এসে ঝুলেছে, কিছুই মনে পড়ছে না। আমি ছুটে চলেছি সুতীব্র গতিতে; আলোর গতিকেও হার মানিয়ে।

হঠাৎ লক্ষ করলাম, দূরের কোনো একটি নক্ষত্র যেন তার মধ্যাকর্ষণ শক্তিতে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই এসে নামলাম সেই তারকালোকে। দূরবীক্ষণযন্ত্রটা চোখের সামনে ধরে একবার তাকালাম ফেলে আসা পৃথিবীটার দিকে। আনন্দে, বিস্ময়ে আমি তখন থর থর করে কাঁপছি। আমার মনের সাধ এভাবে পূরণ হবে, কে জানতো। খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম প্রায়। এদিক-ওদিক একবার তাকালাম। কোথাও

কেউ নেই। জন-মানবের কোনো চিহ্ন নেই এই নক্ষত্রলোকে। আবার তাকালাম নিচে, পৃথিবীর বর্ণিল মুখের দিকে।

এখন আমি পৃথিবীর অতীতটাকে দেখতে পাচ্ছি। দেড় হাজার বছর আগের সোনালি অতীত আমার দু'চোখের সামনে। আমি বিস্মিত! আমি মুগ্ধ! হাঁ, এই তো খেজুর বাগানের শহর-মদীনা–মুনাওওয়ারা। নূরে নূরে যেন সব প্লাবিত। মানুষগুলো নূরের ফেরেশ্‌তাদেরও যেন হার মানায়। কেমন প্রশান্ত, বিনম্র ও অবনত দৃষ্টি তাঁদের! ছেঁড়া, তালি দেয়া পোশাক। কিন্তু শাহানশাহ্‌দেরও বুঝি তা দেখে ঈর্ষা হয়। সবাই এখন ছুটে চলেছেন মসজিদের দিকে। এই শান্ত শহরটিই শান্তির বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে সারা দুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এখানেই জমা হচ্ছে পূর্ব-পশ্চিম, রোম-পারস্যের সবরকম রাজস্ব, সবরকম ট্যাক্স।



তিন

এ শহরের সবখানেই আমার চোখ কেবল ঘুরলো। কিন্তু কোথাও কোনো কারাগার আর আদালতের সন্ধান পেলাম না। অবাক হয়ে ভাবলাম, তাহলে বিচারপ্রার্থীরা আসে কোথায়? অপরাধী আর আসামীদেরই বা আটকে রাখার স্থান কোথায়? এরকম কিছু সরল প্রশ্নের জালে আটকে যেতে যেতেই হঠাৎ মসজিদে নববীতে ছেঁড়া, তালি-দেয়া পোশাকপরা অদ্ভুত ভক্তি আর প্রতাপের আবীর মেখে একজন লোককে বসে থাকতে দেখলাম। আমার দু'চোখ চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভালো করে লক্ষ করে দেখি, দু'জন বিচারপ্রার্থী এসে তাঁর কাছে বিচার চাইলো।

সমস্বরে তারা বলে উঠলো : "আমরা দু'জন বিবাদমান ব্যক্তি। আমাদের একজন আরেকজনের প্রতি জুলুম করেছে। অতএব আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করুন এবং আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করুন।"

সান্ধ্য আকাশের গাম্ভীর্য আর অসাধারণ ধীরতা নিয়ে তিনি সব শুনলেন। একের বিরুদ্ধে অন্যের অভিযোগের কিছুই বাদ দিলেন না। তারপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বাদীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'বাদীকে সাক্ষী হাজির করতে হবে আর বিবাদীকে করতে হবে কসম। সুতরাং তোমার পক্ষে কি সাক্ষী আছে? না অপর পক্ষে কসম নেবো?' তখনই বাদী ক'জন সৎ মানুষকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করলো। বাদীর পক্ষে রায় হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিচারকায শেষ হলো। দু'পক্ষই বিদায় নিলো বিচারের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি আর আস্থা নিয়ে। আমি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লাম। এক-আধ গজ মাটির দখল

নিয়ে বছরের পর বছর বয়ে যাওয়া ঝগড়া আর বিচার নামের প্রহসন দেখে অভ্যস্ত আমার এ দু'টি চোখ বেয়ে দরদর করে পানি নেমে এলো। বিস্ময়কর এক পৃথিবী আমি দেখলাম। বুঝতে বেগ পেতে হলো না, কেন এদের কোনো আদালত কিংবা বিচারালয়ের প্রয়োজন হয় না।

আরো দেখলাম, রাত নেমে এলে এ স্বর্গভূমির বাসিন্দারা পরম নিশ্চিন্তে খুলে রাখেন বাড়ি-ঘরের দরজা-জানালা। কোনো সংশয়, কোনো ভয় তাদের নিরাপত্তা আর আশ্বাসের কপাট ভাঙে না। বায়তুল মালের দিকে তাকিয়ে তো আমি হতবাক। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে জড়ো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মালামাল, তোহফা-উপঢৌকন একজন সাধারণ সৈন্যের কাছে। অপার্থিব আস্থার পথ ধরে তিনি এসে সব জমা করছেন বায়তুল মাল-প্রধানের কাছে। একটুও এদিক-ওদিক নেই। কোনো অবিশ্বাসের গোলমেলে চরিত্র এঁদের মাঝে হঠাৎ একতা-বিধ্বংসী ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে আসে না। এদের আস্থা আর ঈমানের সাদা পায়রা কখনো সুযোগ সন্ধানী শিকারীর হাতে তীরবিদ্ধ হওয়ার বিলাপ তোলে না। আমি সব লক্ষ করলাম। বুকভরা শ্রদ্ধা আর বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করলাম। এক সময় দেখলাম, একটি চোর এলো। কিছু চুরিও করলো। কিন্তু রক্ষা পেলো না। সাথে সাথে ধরা পড়লো। হাত কাটা হলো তার। আমার জানতে বাকি রইল না, এ কালের কালজয়ী পুরুষেরা কেন কোনো কারাগার বা কয়েদখানা গড়েননি।

এখানে কারো সাথে কারো অমীমাংসিত কোনো ঝগড়া নেই। কোনো সবলের জোর জবরদস্তির শিকার হচ্ছে না কোনো দুর্বল। আর শিকার হলেও রেহাই মিলছে না সবলের। সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির খড়্গ এসে নামছে তার গর্দানে। হিংসা-দ্বেষ, ক্রোধ-লালসার

বিষাক্ত গোখরো ছোবল হানছে না কাউকে। প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর মন মাতানো ভাব। অন্তর শীতল করা বন্ধন। উপলব্ধি হলো আমার, প্রকৃত অর্থেই এঁরা মানুষ। শাসক-শাসিতের সম্পর্কও এখানে আমাকে অভিভূত করেছে। পরস্পর কী মধুর শিশাঢালা সম্পর্ক! একের প্রতি অন্যের হিতাকাঙ্খার কী চোখ জুড়ানো চিত্র! দূর থেকেও অনুভূত হয় এঁরা সবাই যেন এক কাতারের মানুষ। ভ্রাতৃত্বের পরম মমতার বন্ধনে আবদ্ধ। 'রুহামা-উ-বাইনাহুম্।'

চার

ঝড়ের সমূলে গাছ উপড়ে যাওয়ার মতোই আমার বদ্ধমূল একটি ধারণা একেবারেই নেই হয়ে গেলো, যখন আমার দৃষ্টি ঘুরে এলো শহরের সেনাছাউনিগুলোর দিকে। আমার ধারণা ছিল ইতিহাসের প্রায় সব যুগেই সৈনিকেরা হয়ে থাকে কিছুটা উগ্র ও বদমেজাজি। ধর্ম, সৌজন্য আর সৌহার্দ্যের অভাব থাকে তাদের জীবন ও আচরণে। অথচ কী অদ্ভুত! এখানকার সবাই উজ্জ্বল মশালের আলোর মতো সমাজের অন্ধকার গলি-ঘুপচিতে নূরের পবিত্র আভা ছড়িয়ে যাচ্ছেন। ঘুমের কোলে ঢলে পড়া নীরব আঁধারে এঁরা দুনিয়া-ভোলা একেক জন আল্লাহ-প্রেমিক বান্দা। এঁদের মুখে মুখে মধু আহরণে মশগুল মৌমাছির অপার্থিব গুন গুন সুর। আল্লাহর যিকিরে আন্দোলিত এঁদের জিহ্বা ও ঠোঁট। আবার এঁরাই সূর্যের আলোয় টগবগে সাহসী ঘোড়সওয়ার। দিগ্বিদিক জয় করে চলেছেন মহা প্রতাপে। প্রবল ঝড়ের শিলাবৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপে ব্যস্ত থাকছেন দেশ রক্ষায়, দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে। ভালোর অনুকূলে থেকে তার উত্থান ঘটাচ্ছেন আর মন্দের

প্রতিকূলে অবস্থান নিয়ে ঘটিয়ে দিচ্ছেন তার পতন। 'আশিদ্দা-উ আ'লাল কুফ্ফার'। একটি তিলেও হাত দিচ্ছেন না তাঁরা কুখেয়ালে। বিজিত শহরে প্রবেশ করছেন শান্তির দূত হয়ে। রূপসী বেগানা মহিলার মুখ তাঁদের চোখকে করে দিচ্ছে অবনত। অবনত মস্তকে আল্লাহর দরবারে গভীর শুকরিয়ায় এঁরা থাকছেন বিভোর হয়ে।

আমার জড়াগ্রস্ত চেতনার কপাটগুলো ঠাস ঠাস করে খুলে গেলো। উপলব্ধি-অনুভূতির দিগন্ত বিস্তৃত এক উদ্যানে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, এই যুগের সাধারণ সীমান্ত রক্ষীরাই যদি হন একেক জন খোদার পাগল-আল্লাহওয়ালা, তাহলে কেমন হবে এ যুগের উচ্চতর বুযুর্গ আর খোদা-প্রেমিকদের চরিত্র। এঁরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী পূর্ণভাবে। সবাই আল্লাহতে রাজি। আল্লাহও এঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। 'রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদূ আনহু।'

দূরবীক্ষণযন্ত্রটা ধরে রাখতে রাখতে হাতে ব্যথা ধরে গেছে। হাত নামিয়ে ফেললাম চোখের সামনে থেকে। এতক্ষণ যা দেখলাম, তো নিশ্চয়ই খেলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগ। এ যুগের ইতিহাস এতোটাই পবিত্রতা ও সততা-সমৃদ্ধ আর এতোটাই পুণ্যময় যে, বাস্তবেই এরকম বিস্ময়কর একটি স্বর্ণালি অধ্যায় পৃথিবীতে না থাকলে এ শুধু কল্পনার উপমা-উদাহরণ হয়েই থাকতো। কেউ হয়তো ভাবতেই পারতো না যে, আজকের এই যন্ত্রণাকাতর পৃথিবীর মুখ কখনো এতো মুবারক আর হাস্যোচ্ছল ছিলো। কেউ জানতই না হয়তো, এই দুনিয়ার মুখের ছবি কখনো ছিলো এতো আলোকময়। ভাবনা আর এগিয়ে নিতে পারলাম না। দেখি, সরে যাচ্ছে আমার দু'পায়ের নিচ থেকে শক্ত মাটির আস্তরণ। আমি শূন্যে ঝুলে পড়ছি ধীরে ধীরে। এরপর অতিদ্রুত নেমে আসছি

নিচে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের এক বর্ণময় অধ্যায় খোলা চোখে দেখার রেশ আমার আত্মায়, মন-মগজে তুলছে খুশির উথাল-পাথাল স্রোত। আর দু'চোখ বেয়ে নামছে অঝোর ধারায় শুকরিয়ার অশ্রু।

পাঁচ

উঁচু নক্ষত্রের মনোলোভা আস্তরণ ছেড়ে নেমে এলাম বেশ কিছুটা নিচে। সাথে সাথে কালের দূরত্বও কিছু কমে এলো। দূরবীক্ষণযন্ত্রটা তুলে ধরে আবার পৃথিবীর বিচিত্র দৃশ্য ও ছবির দিকে ঝুলিয়ে দিলাম আমার চোখ। থমকে গেলাম, এ কি দেখছি! এ পৃথিবীর সাথে একটু আগের দেখা পৃথিবীর কোনোই মিল নেই। সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে সব। মদীনা এখন আর রাজধানীর গৌরবে গর্বিত নয়। সে গৌরব-মুকুট শোভা পাচ্ছে এবার দামেশ্‌কের মস্তকে। রাজধানীর চমক-গমক, রূপ-লাবণ্যও বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক।

লক্ষ করলাম, সারাটা শহর জুড়ে বড় বড় ইমারতের সারি। রূপ-সৌকর্যে ঝলমল করছে সেগুলোর উপর ঝুলানো নক্‌শা খচিত চাদর আর মহামূল্য গিলাফ। শহরের বিভিন্ন স্থানে উঁচু উঁচু মিনার। অনেকগুলো দারুণ সুন্দর মসজিদও দেখলাম, মুসল্লী আর নামাযীদের আনাগোনায় জমজমাট।

বড় তৃপ্তি নিয়ে দেখলাম, নানান জায়গায় অগণিত ইলম ও হাদীসের ভাবগম্ভীর মজলিস বসে আছে। ইলম-পিপাসুদের অংশগ্রহণে সেই সব মজলিস হয়ে উঠেছে আরো প্রাণবন্ত। সেইসব মজলিস ও আসরের বুলবুল হয়ে বসে আছেন

মুহাদ্দিসগণ। হাদীসের সুধাপানে আগ্রহী সুধাপ্রার্থীদের পিপাসার্ত হৃদয়গুলো কানায় কানায় ভরে দিচ্ছেন তাঁরা। ভরা বর্ষার আকাশে গম্ভীর মেঘ-ডাকের মতোই অলৌকিক মাহাত্ম্যের আবীর মেখে তাঁরা বয়ান করছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমিয় বাণী-সম্ভার অসংখ্য নবী প্রেমিকের কাছে। আর খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন নবী-প্রেমিকরা দ্বীনের অনেক অনেক অনুন্মোচিত পথের দিকচিহ্ন।

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে দেখলাম, সারাটা শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে হরেক রকম মানুষ। বিচিত্র প্রকৃতির বনী আদমের ভিড়। কেউ এখানে দুনিয়াত্যাগী খোদা প্রেমিক, আবার কেউ প্রাচুর্যে বিভোর; বিলাসী। অহংকারের উত্তাপে বেড়ে ওঠা একজনকে দেখলাম, তিনি খলীফার ছেলে। অগণিত চাকর-বাকর পরিবেষ্টিত আরেকজন ব্যস্ত মানুষকেও দেখলাম। তিনি ইরাকের গভর্নর। মানব-জীবনের এ ধরনের অসংখ্য বৈষম্যের আসমান ভূমিতে ওঠানামা করতে করতে আমার দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে পড়লো। দৃষ্টি ছুঁড়লাম অন্য প্রান্তে। দেখলাম, শরীয়তের কোনো কোনো বিধান আর দণ্ডবিধি এখনো সমাজে চালু আছে। অনেক হারানোর দুঃখের মাঝেও খুঁজে পেলাম অবশিষ্ট আনন্দের আভাস। দ্বীনপ্রেমী আলেমদের খোঁজ করলাম। দেখলাম, তাঁদেরকে দারুণ সম্মান করছে সাধারণ মানুষজন। লুটিয়ে দিচ্ছে তাঁদের পায়ে বুকভরা শ্রদ্ধা, ইহতিরামের সম্পদ। এক-এক করে সমাজের সব ধরনের মানুষের পাতা উল্টিয়ে দেখলাম। অনুভব করলাম, এখনো লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে, মূল্যবোধ সিঁকেয় তুলে দিয়ে প্রকাশ্য অপরাধে, প্রকাশ্য পাপাচারে নেমে পড়েনি কেউ।

মনে হলো, এখনো আল্লাহর ভয় হয়তো তাঁদের মাঝে ঈমানের দ্বীপশিখা মিটিমিটি জ্বালিয়ে রেখেছে।

খলীফা থেকে নিয়ে আমীর-ওমারা, সবার অবস্থাই লক্ষ করলাম। দেখলাম, তারা তাদের বৈভব আর প্রাচুর্য নিয়েই জনসাধারণের মাঝে হাজির হচ্ছেন, মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করছেন। আবার মুসল্লীদের উদ্দেশে ভাষণও রাখছেন কখনো কখনো। তাঁদের আচার-আচরণ, তাঁদের পদক্ষেপ আকাশছোঁয়া প্রতাপ ও অহমিকার পলেস্তরায় মোড়ানো। এরপর দেখলাম মুসলমানদের বিশাল এক সাম্রাজ্যের চেহারা। অভিভূত হলাম এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দেখে। এর এক সীমা গিয়ে ঠেকেছে সিন্ধু পর্যন্ত। আরেক প্রান্ত এসে চুমু খেয়েছে আটলান্টিকের লোনা স্রোতে। এই বিশাল ভূখণ্ডের একপ্রান্ত থেকে দ্রুতগামী একটি উট আরেক প্রান্তে পাঁচমাসের আগে পৌঁছুতে পারবে না।

আমি বুঝতে পারলাম, এটাই উমাইয়া শাসকদের আমল। আমি এখন অবস্থান করছি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের শুরুর যুগে।

ছয়

আরো নিচে নেমে এলাম আমি। দেখলাম, আধুনিকতার রঙিন পরশ মাখানো এক অপরূপ তিলোত্তমা নগরী। দজলা নদীর দু'ধার ধরে বেড়ে ওঠা এই রঙিন মেলায় দেখতে পেলাম, বিচিত্র মানুষের মিছিল। বিভিন্ন ভাষা ও গোত্রের সহাবস্থান। আরবী, পার্সিক, রোমান, হিন্দী আর তুর্কীদের পদচারণায় শহরটি সরগরম হয়ে আছে।

খলীফার সুবিশাল প্রাসাদ দেখলাম। প্রাসাদটি যেন ভিনদেশী সেনাদের পাহারায় পরিবেষ্টিত। একই চিত্র নজরে পড়ছে উজীর-আমীরদের প্রাসাদগুলোতেও। তাদের সবাইকে দেখলাম, একেকজন রাষ্ট্রীয় সওয়ারীতে চড়ে বেড়াচ্ছেন শহর থেকে শহরে, পথে পথে প্রতাপ ছড়িয়ে। এদেশের জনসাধারণের বিরাট একটি অংশ আমোদ-প্রমোদ, বিলাসিতা আর অর্থহীন তামাশায় বিভোর।

দেখতে চাইলাম বিচারপতি, প্রধান বিচারপতিদের চেহারা। চমকে উঠলাম। আহ্ কতো পরিবর্তন ! তাদের দ্বারে দ্বারে এখন মজলুম মানুষের ভিড়। বিচার চলছে বড় ঢিমে তালে, শামুকের গতিতে। জালে আটকে পড়া অসহায় মাছের মতো দীর্ঘদিন যাবৎ ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে বহু মজলুমের জীবন-মরণের ফয়সালা। কারাগারের কুঠুরিগুলোর দিকে নযর পড়তেই আমার চক্ষুস্থির। আগের সবগুলো তালাবদ্ধ কুঠুরি দেখছি, চোর-ছিনতাইকারী আর নতুন মুখের অনভ্যস্ত অপরাধীদের সংখ্যায় বোঝাই।

কিন্তু মসজিদগুলো দেখলাম, মুসল্লীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। মাদরাসাগুলোতে বহু সংখ্যক ইলম-সন্ধানীর আনাগোনা। ওয়াজ মাহফিলে জনসাধারণের যাতায়াতের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো এবারও। দেখলাম, গুনাহ থেকে শক্তমনে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মতো মানুষের সংখ্যাও বহু। প্রতি জুমার দিনে ইসলামের শান্তিনীড়ে আশ্রয় নিচ্ছে অগণিত অ-মুসলিম। ভাবলাম, এখনো মানুষ হৃদয়ের অমোঘ দাবি ভুলে যায়নি। হারিয়ে ফেলেনি আত্মার ডাক। ফলেই, ধর্ম তাদের হৃদয়-মনে, ইসলাম তাদের আত্মায়-অনুভূতিতে রাজত্ব বিস্তার করে আছে পুরো মাত্রায়।

দুনিয়াত্যাগী ও ওলী-আল্লাহদের একটি দলেরও সাক্ষাৎ পেলাম শহরটিতে। রাজা-বাদশাহ, ধন-প্রাচুর্য আর জাগতিক জৌলুসের ব্যাপারে এঁরা বড় উদাস, অকৌতূহলী। প্রকৃত জীবনসুধা হাসিলের জন্যে তাঁদের কাছে দলে দলে চলে আসছেন খোরাসান, সিন্ধু আর ইরানের অসংখ্য মানুষ। সমগ্র দুনিয়াটা পায়ের কাছে এসে জড়ো হচ্ছে তাঁদের। রাজা-বাদশাহরাও তাঁদের সামনে সংকুচিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছেন। আমি দেখলাম– দ্বীন ও ধর্মের এক নূরানী শক্তি আলো ছড়িয়ে আছে সবরকম বস্তুরাজ্যের উপর। বিশ্বাস ও পুণ্যের দাপট দেখে মুগ্ধ হলাম। সমীহ আর সম্মানের ক্ষেত্রে পুণ্যের এ প্রভাব স্থান করে নিয়েছে অনেক উর্ধ্বে।

দ্বীন ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের এই সময়টাতেও দেখলাম, শাসন ও কর্তৃত্বের পুরোটাই ধরে রেখেছে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরাই। একদিকে তো উজীর-আমলাদের দর্পিত সন্তানদেরও দেখা যাচ্ছে, হাঁটু গেড়ে বিনয়ের সাথে বসে আছে ওলী আল্লাহ, আলেম-উলামার সামনে। অপরদিকে শাসক ও কর্তা শ্রেণির জাঁকজমক ও আকাশচুম্বী জৌলুসের মাঝেও দ্বীন-হীন অবস্থায় দ্বীনের অনেক সাধকই নিভৃত জীবনে খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের ঠিকানা। দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহের সব আয়োজন ঠিক আছে; কিন্তু কর্তৃত্ব ও প্রভাবের লাগামটাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে শুধুই রাজপ্রাসাদের সুরক্ষিত দুর্গে।

দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এ বিশাল সাম্রাজ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হৃদয়ে হঠাৎ উদয় হলো, এটাতো সেই দেশ, যে দেশের খলীফার স্বগতোক্তি জনতার মুখের বুলিতে পরিণত হয়ে আছে। কারণ খলীফা একবার দ্রুত ধাবমান এক আকাশচারী মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে সানন্দে উক্তি করেছিলেন– 'যেখানেই

তোমাদের বৃষ্টি বর্ষাও না কেন হে মেঘ! তোমার (উৎপাদিত ফসলের) রাজস্ব আমার হাতে পৌঁছাবেই।'

মনে হলো, এটাই সোনারপুরি বাগদাদ–আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী। আর আমি নবম শতাব্দীর কোলে।

এরপর আমার দৃষ্টি ঘুরে এলো জাবালে তারেকের অসমতল ধূসর ভূমি ছুঁয়ে। পাহাড়ের পাদদেশে দেখলাম, জমজমাট বসতিপূর্ণ একটি প্রাচীন শহর। পুরাতন সভ্যতা আঁকড়ে থাকা এই শহরটিতে চোখে পড়লো, অজস্র রঙিন ইমারত, উঁচু প্রাসাদের সারি। চোখে পড়লো আরো মন মাতানো অনেক ফুলের বাগান। মখমলের গালিচার মতো বিছানো মসৃণ রাজপথ। কোথাও দু'কূল ছাপিয়ে আসা প্রবহমান ঝর্নাধারার চোখ জুড়ানো চিত্র। আমার মনে পড়লো, কর্ডোভা নিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পাঠ। আমি জানতাম, এর দৈর্ঘ্য ষোল মাইল। আর প্রস্থে এ শহর ছ' মাইল। কয়েক হাজার ঘর-বাড়ি, অজস্র দোকান-পাট, বাজার-ঘাট, মসজিদ-মাদরাসা ও সরাইখানা-হাম্মামখানার এই শহরটিকে ঘিরে রেখেছে চোখজুড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বহু নির্দশন।

সাত

দৃষ্টি আমার চঞ্চল। দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে এদিক-সেদিক চোখ ঘুরিয়ে কর্ডোভার পাশে আরো একটি ছোট টিপ-টপ শহরের চেহারা দেখলাম। অদ্ভুত সুন্দর। এর চেয়ে সুন্দর কোনো শহর পৃথিবীর বুকে আমার নযরে পড়েনি আর। আমি ভাবলাম, হয়তো এটিই ইতিহাসখ্যাত সেই ফুলের শহর 'যাহরা-নীলাম্বরী।'

আমি চলেছি খ্রিষ্টীয় দশম শতকের শেষ পাদমূল আর একাদশ শতকের সূচনাকালের জৌলুসভরা অধ্যায় ভ্রমণ করতে করতে। এই যুগটি হচ্ছে স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান নাছের কিংবা তার ছেলের শাসনামল।

দূরপাল্লার দূরবীনের ফোকাস আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। পাহাড় পর্বত, নদ-নদী ও সমুদ্র ডিঙিয়ে আমার নযর এসে স্থির হলো শক্তিশালী আরেকটি বিশাল সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যের উপর। এই সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র– নিশাপুর তার আয়ত্তাধীন করে রেখেছে খোরাসান, ইরাক, ইরানসহ অনেক বড় বড় রাজ্য। আর সেই সব রাজ্যের শাসকদেরকে দেখা গেলো, বাগদাদে বসেই তারা শাসন পরিচালনা করছেন নিজ নিজ রাজ্য। শাসন পরিচালনা করছেন বড়ই প্রতাপ আর দাপটের সাথে। দূরের কোথাও যখন-তখন কাউকে তারা নিয়োগ দিচ্ছেন আর কাউকে করছেন বরখাস্ত। এই সাম্রাজ্যের কর্ণধার আল্প আরসালানকে দেখলাম, ফিরিঙ্গীদের দেশে দেশে গিয়ে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করছেন। তাদের খ্রিষ্টান সম্রাটকে আনছেন বন্দি করে এবং তাদের উপর ধার্য করছেন রাষ্ট্রীয় কর।

দেখতে দেখতেই এই বিশাল সাম্রাজ্যের আরো বহু বিস্তৃতি ঘটলো। আরো সম্প্রসারিত হলো রাষ্ট্রটি বাদশাহ মালিক শাহ আর তার প্রধান উজীর নিযামুল মুলকের আমলে। সেখানে অসংখ্য ছাত্রের পবিত্র কলরবে মুখর একটি মাদরাসাও চোখে পড়লো।

দেখা গেলো, পড়তে আসা ছাত্রদের শিক্ষার মান ও নিয়তের গভীরতা যাচাই করতে একরাতে মাদরাসাটিতে এসে হাজির হলেন প্রধান উজীর নিযামুল মুলক। তিনি ঘুরে ঘুরে মাদরাসার প্রতিটি কামরায় ঢুঁ মারছেন। কথা বলছেন ছাত্রদের সঙ্গে।

নিযামুল মুলকের চেহারায় অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভের ছাপ ফুটে উঠছে। এ পর্যায়ে বইপত্রের মাঝে প্রায় সম্পূর্ণ ডুবন্ত এক ছাত্রের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। কোনোদিকেই ছাত্রটির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। নিযামুল মুলক তার সাথে কথা বললেন। ছাত্রটির কথা শুনেই দেখলাম, নিযামুল মুলকের গম্ভীর ও ক্ষুব্ধ মুখের আদল দিলখোলা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি উপস্থিত সকলের সামনেই বললেন : 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করার যে নিয়ত এই ছাত্রটি করেছে, তার জন্যই এই মাদরাসাটিকে সচল রাখা হবে। অন্যথায় এই মাদরাসাটি বন্ধ করে দিতাম আজ।'

বুঝতে দেরি হলো না, এটাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ নিযামিয়া মাদরাসা, আর শিক্ষা গ্রহণকারী নিভৃতচারী ছাত্রটির নাম ইমাম গায্যালী। এই মাদরাসার ব্যয়ভার বহন করছে সালজুক শাসকেরা। আনন্দ লাগলো বিষয়টি উপভোগ করে আমার। পাশে দেখলাম আরেকটি মাদরাসা : যেখানে ইল্‌ম অন্বেষণে মগ্ন হয়ে আছে ইমামুল হারামাইনের মতো কামেল মানুষসব। দেখলাম আরো বহু শিক্ষাঙ্গনের উজ্জ্বল মশাল। দেখে আমার চোখ জুড়ালো। তৃপ্তির আমেজে ভরে উঠলো আমার তৃষ্ণার্ত প্রাণ। আল্লাহ্‌র দরবারে দুআ করলাম সালজুক রাষ্ট্রটির জন্য। দুআ করলাম তার বাদশাহ ও উজীরদের জন্য।

অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম, ফিরিঙ্গীরা 'ক্রুশ' ধারণ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দিকে ধেয়ে আসছে। আক্রমণ চালাচ্ছে নির্বিচারে। তাদের এই প্রবণতা এক সময় রূপ নিলো উন্মাদনায়। দেখলাম, হাজার হাজার কিশোর-যুবা আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ছুটে চলেছে

বাইতুল মোকাদ্দাস দখল করার লক্ষ্য নিয়ে। দেখতে দেখতে অল্প বয়সের ফিরিঙ্গী রণ-পাগলদের অনেকেই পথের উপর ভেঙ্গে পড়লো। মারা পড়লো আরো বহু। ইউরোপীয় সম্রাটদের দর্পিত পদক্ষেপ আর 'আলআকসা' দখলের কঠিন শপথের উত্তাপ লেগেছে তাদের গায়ে। ছুটে এলো আরো অগণিত ক্রুসেড সেনাদল। 'আলকুদস' তারা দখল করলো। আরও দখল করলো সিরিয়ার প্রধান প্রধান শহর আর ফিলিস্তীনের অপরূপ সুন্দর যমীন। পতন ঘটলো মিসর ও ইরাকের। পাঁয়তারা চালালো তারা হিজায দখলেরও। তাদের তলোয়ারের বিধ্বংসী ঝনৎকারে কেঁপে উঠলো সারা দুনিয়া। কেঁপে উঠলো কল্যাণ ও মানবতার প্রাসাদ। মুসলমানের রক্ত বয়ে গেলো আলকুদসের পবিত্র নগরীর পথে-ঘাটে। খুনের জোয়ার বইলো মধ্যপ্রাচ্যের পাথুরে যমীনে। সে জোয়ারে আছাড় খেয়ে পিছলে পড়লো ঘোড়ার পাল। পিছলে পড়লো মানুষ আর শান্তিকামী মুমিনের প্রতিবাদ। চরমে পৌঁছুলো ক্রুসেডারদের জিঘাংসা। পাশবিকতার এক নগ্ন চূড়ায় দাঁড়িয়ে এক ইউরোপীয় শাসক স্পর্ধিত ঘোষণা করলো, মদীনার মাটিতে সমাহিত মোবারক দেহের অপমান করবে সে। (নাউজুবিল্লাহ)।

আট

এই সবকিছুই আমি দেখলাম। ব্যথায় ভারি হয়ে যাওয়া চোখ তুলে তাকালাম সালজুক রাষ্ট্রটির দিকে। মনে মনে বললাম, কোথায় এই রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ রাজ্যাধিপতিরা, যারা এতদিন ফিরিঙ্গীদের সাথে একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন?

ফিরিঙ্গীদের পরাজিত করে তারা নিশাপুর মাথায় তুলতেন! অথচ আজ মুসলমানদের বড় দুর্দিন! বড় দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক।

জনসাধারণ, শাসকশ্রেণি আর আলেম সমাজের প্রায় সবাইকেই দেখলাম, ফিরিঙ্গীদের ব্যাপারে একেবারেই নিরুৎসাহী, সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার বুকের ভেতর শংকার দোলা লাগলো ইসলামের অস্তিত্ব আর স্থায়িত্বের ব্যাপারে।

চরম এই দুঃসময়ে হঠাৎ দুই লৌহমানবের সাক্ষাৎ পেলাম। যুদ্ধের ময়দানে এঁরা খোদাপ্রেমী মুসলিম। অবিচল ঋজু পদচারণায় এগিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের একজন সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গি, অন্যজন সিংহপুরুষ সিপাহ্সালার সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী। তাঁরা সেনাদল নিয়ে ক্রুসেডারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রবল প্রতাপে। বীর সালাহউদ্দীনকে দেখলাম, একের পর এক অবিরাম আক্রমণে পর্যুদস্ত করে চলেছেন নিষ্ঠুর ক্রুসেডারদের। পরাজিত করছেন তাদের একের পর এক রণক্ষেত্রে। তারপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্র কাঁপিয়ে হাঁক ছেড়ে ডাকলেন সেই ক্রুসেড-পাণ্ডাকে, যে মদীনার মাটিতে শায়িত পবিত্র দেহকে অপদস্থ করার শপথ করেছিলো। চিৎকার দিয়ে একথা বলতে বলতে মানবরূপী সেই শয়তানের মস্তক বরাবর আক্রমণ চালালেন, 'আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননা-চিন্তার প্রতিশোধ নেবো আমি।'

'আলকুদ্স' মুক্ত করলেন বীর সালাহউদ্দীন আইয়ূবী। মুক্ত করলেন শামের হারানো নগরীগুলো খ্রিস্টানদের কবল থেকে। চেহারা উজ্জ্বল হলো মুসলমানদের। দীর্ঘ পরাজয়ের পর বিজয়ের দিগন্তে তারা প্রবেশ করলো। এ বিজয় যেন আগের সব বিজয়ের

গর্বকে ম্লান করে দিল। বীর সালাহউদ্দীনকে দুআ জানালেন জ্বিন, ইনসান আর ফেরেশতারা।

আরো নিচে নেমে এলাম আমি। দেখলাম, সামান্য আগের দেখা বাগদাদে পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে আক্রমণকারী তাতারীদের মিছিল। তাতারীদের সেই মিছিল বাগদাদের নগর-দরজাগুলো অতিক্রম করলো। ধ্বংস আর রক্তপাত ঘটালো তারা বাগদাদের সর্বত্র। রক্তের নহর বইল অলিতে-গলিতে। মানুষের ছিন্ন মস্তকের স্তূপ দিয়ে বানানো হলো গম্বুজ। হত্যা করলো তারা খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহকে নির্মমভাবে। কলজে-কাঁপানো সেই বিভীষিকাও দেখলাম। চোখ ছাপানো অশ্রুর স্রোতে চলমান ছবিগুলো সব ঝাপসা হয়ে আসছিলো।

অশ্রু মুছে আবার লক্ষ করলাম। অমূল্য কিতাব ও গ্রন্থ আর অগণিত হাতে লেখা দামি পাণ্ডুলিপির স্তূপ এনে তাতারীরা ফেলছে দজলা নদীর স্রোতে। দজলার পানি একবার কিতাবের পাতা ধুয়া কালি মিশে কালো হয়ে যাচ্ছে, আরেকবার মানুষের রক্তের ঢলে টকটকে লাল রঙ ধরছে। সে যে কী দৃশ্য! একটি শান্ত নদীর পাশে এক খণ্ড জাহান্নামের চিত্র দেখে আমার দু'চোখ প্লাবিত হলো আবার। বাগদাদ নগরীকে চেনাই যেতো না, যদি দজলার তীরেই বাগদাদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমার আগে থেকেই না থাকতো।

ইসলামী দুনিয়ার ভেতর বিভিন্ন প্রান্তেই তখন তাতার পঙ্গপালেরা সর্বনাশা তাণ্ডবে লিপ্ত। শহরে-নগরে নামিয়েছে তারা বিপর্যয়ের ধস। বিধ্বস্ত করেছে পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী শহরগুলোও। ভেঙে ধূলিস্মাৎ করে দিচ্ছে প্রাসাদ, ইমারত আর মসজিদ-মাদরাসার সব সুউচ্চ কাঠামো। জ্বালিয়ে ছারখার করছে বাড়ি-ঘর, বসতি। গভীর

হিংসা নিয়ে মানব সভ্যতার কবর রচনায় মশগুল হয়ে পড়েছে ওরা। যেখানেই পাচ্ছে কাতারে কাতারে দাঁড় করিয়ে খুন করছে নিরীহ মুসলমানদের।

দেখে দেখে একেবারে চুপসে গেলাম। ঝড়ের রাতে নিভু নিভু প্রদীপের কাঁপুনি উঠলো আমার বুকে। আমি এক সর্বহারা বালকের বিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে দেখলাম, একই অবস্থা চলছে খোরসানের খাওয়ারেযাম শাহের রাজত্বেরও সবখানে। ইরাকের আব্বাসীয় সালতানাতও তাতার পঙ্গপালের এই জগৎবিনাশী থাবা থেকে রেহাই পায়নি। পৃথিবীর প্রায় সবখানেই মুসলমানদের পতনের চিত্র চোখে পড়লো। চোখে পড়লো গ্লানিময় হারের হাজারো ছবি। ভীতু শৃগালের পলায়নপর চেহারাই যেন ফুটে উঠেছিলো অসংখ্য মুসলমানের মাঝে ।



নয়

ইসলামের দিগ্বিজয়ী অস্তিত্ব কত দিন টিকে থাকবে- এ ব্যাপারে আমি আবারো শংকিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, হয়তো এ মুহূর্তটিই মুসলমানদের বিপর্যয়ের গহ্বরে ভেঙে পড়ার চরম ও শেষ ধাপ। এরপর আর রক্ষা নেই। আর কূল-কিনারা মিলবে না মুসলমানদের। অকস্মাৎ অনুভব করি, আমার অনুভূতির সূক্ষ্ম তারগুলো টন টন করে উঠলো। তাকিয়ে দেখি, তাতার বাহিনী দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। দিগ্বিজয়ী ইসলামের বিজয়ী রূপ আবারো ফিরে আসছে। উপলব্ধি হলো আমার, এই দ্বীনের কখনো পতন হবে না। এর কোনো বিলুপ্তি নেই। চিরদিন তার অস্তিত্ব থাকবে এবং এই ধর্মই পৃথিবীর সমস্ত দাম্ভিক আর প্রতাপশালীর উপর আপন মহিমায় প্রভাব বিস্তার করে চলবে।

ইসলামের প্রভাব টিকে থাকলেও মুসলমানের প্রতাপে ভাটা পড়েছে। ইসলামী দুনিয়ার চারদিক থেকেই নিস্তেজ ও ঘুমকাতুরেদের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে। কোথাও এমন কোনো দৃশ্য দেখতে পেলাম না, যা চোখ ঠাণ্ডা করে দেয়, বক্ষে তুলে খুশির মউজ আর অন্তরে জাগায় আশার দোলা। তবে, হঠাৎ এশিয়া মাইনরের দিকে চোখ পড়তেই জীবন ও সংগ্রামের এক নতুন স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম উদ্যম ও হিম্মতের নতুন আলামত। গাজী উসমান খান সেখানে একটি নতুন রাজ্যের বুনিয়াদ রেখেছেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই নবীন রাষ্ট্রটির

ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। সেই রাষ্ট্রের সিংহশাবক দ্বিতীয় গাজী মুহাম্মদ দখল করলেন খ্রিস্টান জগতের রাজধানী কল্পপুরী– ইস্তাম্বুল। ইতিহাসের ঘড়িতে সময় তখন খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক। তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন খ্রিস্টান জগতের আরো ভেতরে। জয় করেছিলেন আরো বহু অঞ্চল।

চোখ ঘুরাতে ঘুরাতে আবারো তাকালাম স্পেনের দিকে। দেখলাম, কর্ডোভা আর তার আশপাশের এলাকাগুলো ইসলামের প্রভাবমুক্ত হয়ে খ্রিস্টানদের করতলে চলে যাচ্ছে। বিস্ময়ে 'থ' হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম মসজিদগুলো সব গীর্জায় রূপ নিয়েছে। সেখান থেকে ভেসে আসছে হালকা সংগীতের সুর। বাজছে আযানের পরিবর্তে ঘণ্টাধ্বনি। আমার কান্না পেলো এসব দেখে। বেদনায় চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। দৃষ্টি ছুঁড়লাম স্পেনের দ্বীপে। দেখলাম, গ্রানাডার ইসলামী চেহারায় বসেছে কুফুরির হিংস্র নখের থাবা। ইসলামের একটি দ্বীপ যেন কোনোভাবে ভেসে আছে অন্ধকার আর কুফুরের সমুদ্রের মাঝে।

অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। হঠাৎ দেখলাম, সেই দ্বীপে প্লাবন শুরু হয়েছে কুফুরি, ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের। মুসলিম অঞ্চলে খ্রিস্টান সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড এলো আধিপত্যের কাঁটা লাগানো কার্পেট বিছিয়ে। দেখলাম বনু আহমারের শেষ শাসক আবু আব্দুল্লাহকে। তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে চাবি তুলে দিলেন রাণী ইসাবেলার হাতে। করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠলো ইতিহাস। চোখে পড়লো, আল-হামরার দিকে বিদায়ী দৃষ্টি ছুঁড়ে কাঁদছেন আবু আব্দুল্লাহ। পরাজয়ের অশ্রুভেজা পথ ধরে পিছিয়ে চললেন তিনি মরক্কোর দিকে।

অল্পক্ষণ পরই দেখলাম, আর বাকি নেই। স্পেনের সবগুলো মুসলিম অঞ্চল, শহর-বন্দর খ্রিস্টানদের দখলে চলে গেছে। ধর্মত্যাগে বাধ্য হচ্ছে বহু মুসলমান। মসজিদগুলো হয় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, নয়তো পরিবর্তিত হয়েছে গীর্জায়। মাদরাসাগুলো বন্ধ। গ্রন্থাগারগুলো পুড়ে ছারখার।

গৌরবময় একটি সভ্যতার সমস্ত আলামত এখন যেন বিলুপ্তির মাঝে লীন হওয়ায় ব্যস্ত। বিশ্বাসী সব মানুষ যেন চারদিক থেকে অক্টোপাসের পেঁচানো বাহুতে আটকে যাওয়া প্রাণীর মতোই ছটফট করছে। আক্ষেপ হলো। আফসোস হলো। দীর্ঘ আট শতাব্দী ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাজ্য এখন খ্রিস্টানদের রাজ্য হয়ে গেলো। সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না একজনও ঈমানদারকে। সন্ধান মিলছে না এমন কারুর, যিনি বিশ্বাস করেন– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

দশ

এসব ছবি আমি সহ্য করতে পারলাম না। আবার মহাশূন্যে ভেসে উঠলাম। সামান্য সময় পরই একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু নক্ষত্রে পাড়ি জামালাম। দূরবীক্ষণযন্ত্রের কাচে চোখ রাখতেই দেখলাম, দক্ষিণ এশিয়ার অভূতপূর্ব সৌন্দর্যে ভরা একটি সবুজ অঞ্চল। সময় তখন খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম যুগ। বঙ্গের রাজধানী নদীয়ায় লক্ষণ সেন নামের এক অত্যাচারী রাজা এক দুপুরে রাজমহলে খাবার-দাবার আর হৈ-হুল্লোড়ে মজে আছে। রাজ্যের সব সৈন্য-সামন্ত আর কর্মচারী বসে আছে আয়েশী

আড্ডায়। অত্যাচারিত বঙ্গবাসীর কান্নার ধ্বনির সাথে সে দুপুরের আরাম-আয়েশ আর উল্লাস যেন বিদ্রুপ করছিলো। এ সময়ই এক দুর্দান্ত সাহসী ঘোড়সওয়ার তাঁর সতের জন সঙ্গী সাথে নিয়ে লক্ষণ সেনের মহলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাসাদরক্ষীরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগলো যে যেদিকে পারে। অল্পক্ষণেই ঘোড়সওয়ার দলের তরবারির আঘাতে মারা পড়লো অনেকেই। উপায় না দেখে লক্ষণ সেনও পালালো নৌকায় চড়ে, গোপন পথে।

নদীয়ার মসনদ গর্বিত হলো সাহসী ঘোড়সওয়ার ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পরশে। এরপর গৌড়ের রাজধানীও হলো বখতিয়ারের করতলগত। তিনি নিয়ে এলেন ন্যায়পরায়ণতার এক অনাবিল শান্তির শাসন। মনুষ্যত্ব ও মানবতার শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলো বাংলায়।

আনন্দ আর তৃপ্তি নিয়ে এই দৃশ্যটি দেখলাম। হঠাৎ দেখি কি, ক্ষিপ্রগতিতে নিচে পড়ে যাচ্ছি আমি। হুড়মুড় করে শব্দ হলো! মহাশূন্যে কি ভয়াবহ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো? শক্ত কোথাও আটকে পড়ে আছি। তাকিয়ে দেখি হাতে আমার দূরবীনটিও নেই। আমি মশারির সাথে জড়িয়ে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে পড়ে আছি। একদম বোকা বনে গেছি আমি। ভালো করে চোখ পিটপিট করে দেখলাম, আমার অন্ধকার কামরায় আমি এখন এক ছোট্ট দুর্ঘটনার শিকার। খাটের ভাঙা স্ট্যান্ডগুলো এখন একটুও নড়ছে না। মনে মনে বললাম, আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার ভালো চেয়েছেন। তাই আমাকে মুসলিম জাহানের অজস্র ঘটনা দুর্ঘটনার

চিত্র দেখিয়েছেন স্বপ্নে। দেখিয়েছেন মুসলিম জাতির উত্থান-পতনের হাজারো হৃদয় তোলপাড়-করা ছবি।

স্বপ্নে আমি মুসলিম ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পেয়ে গেলাম। আল্লাহ আমাকে দেখালেন খেলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগ আর মুসলমানদের ন্যায়-নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতার দৃশ্য। দেখালেন, কীভাবে কাফের হয় মুসলমান, দাম্ভিক ধর্মদ্রোহী সকাতরে আসে ধর্মের আশ্রয়ে ছুটে। শেষ পর্যন্ত এটাও দেখালেন, কীভাবে নৈতিক পতন ও আত্মবিস্মৃতির ফলে মুসলমান হয় ধর্মহারা, মুরতাদ; পরাজয়ের শৃঙ্খল গলায় পরে কীভাবে বিশ্ব ইতিহাসে হয় তারা কলঙ্কিত।

এইসব কিছুই দেখলাম স্বপ্নে। ইতিহাস আর অতীতের ছবি এসব। হাজার মুখের ছবি। সুখের ছবি, কান্নার ছবি উত্থান-পতনের এই ধারাবাহিকতায় বর্তমান কতই না বেদনাময়। ইসলাম আর মুসলমান এখন দুনিয়ার মানবতাবিরোধী, শান্তি বিনাশী সম্মিলিত শক্তির চোখে আতংকের কারণ হয়ে গেছে। তারা উঠে-পড়ে লেগেছে বিশ্বমুসলিমের বিরুদ্ধে। সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানদের রক্ত বয়ে যাচ্ছে। কী নিদারুণ ট্র্যাজেডি পার হয়ে যাচ্ছি আমরা! এ সময়টা কি আগামী সময়ের ইতিহাস-পাঠক মুসলিমকে কাঁদাবে না? অথচ আমরা কেমন নির্বিকার কাটিয়ে যাচ্ছি।

সাবধানে মশারিটা ফাঁক করে উঠে দাঁড়ালাম। প্রত্যয়ের একটি অঙ্গার যেন আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। শপথের প্রশস্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে আমি অনুভব করলাম, আমার ভেতরে নিঃশব্দে অনুরণিত হচ্ছে একটি অঙ্গীকার। আজ থেকে আমি ইসলামের একজন

নির্ভীক সৈনিক হবো। শিক্ষায়, দীক্ষায়, চিন্তায় ও কাজে লড়ে যাবো দিগ্বিজয়ীর মতো দুশমনের বিরুদ্ধে সাচ্চা হৃদয় নিয়ে। দুআ করবো আল্লাহর কাছে, আর কখনো যেন ইসলামী দুনিয়ায় তাতার-আক্রান্ত বাগদাদ আর খ্রিস্টান-আক্রান্ত স্পেন-সভ্যতার ইতিহাস কালের ঘুরতে থাকা চাকায় ঘুরে না আসে।

ডাহুকের মুখের রক্তে তার বাচ্চার চোখ ফুটে। সেই[১] বেদনার ডাহুক রক্তের ওম দিয়ে আর কতো ফুটাবে নয়া আগন্তুকের চোখ! ইতিহাস আর কতোবার মজলুম মুসলমানের রক্তে রাঙাবে কাগজ! ⊙

তথ্যপঞ্জিকা

[১] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ১৪৪৩
[২] ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ১৪৩৮
[৩]. মুসনাদে আহমদ
[৪] . ইবনে মাজা- ২২৪৭
[৫]. সহীহ বুখারী- ২৭৫৬; সহীহ মুসলিম- ১০০৪;
[৬]. মিশকাত- ২৩৫৫
[৭]. মুসনাদে আহমদ- ৯০০৯
[৮]. মুসনাদে আহমদ- ৮৪১৭; জামে তিরমিযী- ২৩৭৮
[৯]. ইবনে মাজাহ- ২৩১৮
[১০]. জামে তিরমিযী
[১১]. মেশকাত- ৫২৬৩
[১২]. মেশকাত- ৫২৪৮

লেখকের অন্যান্য বই

- নবীজীবনের দ্যুতিময় কাহিনীগুচ্ছ
  সবুজ গম্বুজের ছায়া

- সাহাবীগণের হৃদয়ছোঁয়া আত্মদানের চিত্র
  ইতিহাসের লাল আস্তিন

- শিশু-কিশোরদের জন্য
  মাহাবাযে কেরামের গল্প

- হাদীস ও ইতিহাসের গল্পপাঠ
  সকালের মিষ্টি রোদ

- দুই মনীষীর জীবন
  এই গরবের ধন

- কিশোর-কিশোরীদের জীবন গড়ার বই
  শুধু তোমাদের জন্য

- **আল্লাহর পথের ঠিকানা**
  [উর্দূ ভাষণের সংকলন–
  'তা'মীরে ইনসানিয়াত'-এর অনুবাদ]

- **পত্রিকায় লেখালেখি**
  স্টাইল ও কলা-কৌশল

পাঠকের পাতা

লেখক পরিচিতি

শরীফ মুহাম্মদ।
আলেমে দ্বীন, সৃজনশীল লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, সাংবাদিক।

পিতা: গোলাম রব্বানী; মাতা: ফেরদৌস বেগম।
জন্ম: ১২ নভেম্বর ১৯৭১ ময়মনসিংহে।

শিক্ষা: দাওরায়ে হাদীস, ১৯৯২, জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা।

পেশা: সাংবাদিকতা, লেখালেখি ও শিক্ষকতা। বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ ও নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আলকাউসার। সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, মাসিক আল জামেয়া, মাসিক যমযম ও বার্তা২৪ ডটনেটের সর্ম্পাদনা বিভাগে কাজ করেছেন।

লেখালেখি: লেখেন প্রবন্ধ, ফিচার, অনুবাদ ও কলাম। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক জাগো প্রহরীতে ১৯৮৮ সালে। ছাত্রজীবনেই তাঁর লেখালেখির সূচনা। দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় সৃজনশীল, সাহিত্যপূর্ণ, অনূদিত ও বিশ্লেষণধর্মী তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকাশনা: প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৫টি। সাহাবায়ে কেরামের গল্প, সবুজ গম্বুজের ছায়া, ইতিহাসের লাল আস্তিন, জীবনের নানা রঙ, শুধু তোমাদের জন্য, সকালের মিষ্টি রোদ, এই গরবের ধন, পত্রিকায়

লেখালেখি: প্রস্তুতি ও কলাকৌশল তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। একাধিক ছদ্মনামেও তিনি লেখেন। আকাবিরের জীবন ও কর্মের ওপর কয়েকটি প্রামাণ্য স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন।

লেখালেখির বাইরে সম্প্রতি তিনি ইসলাম এবং চলমান ইস্যু নিয়ে উপস্থিত বিতর্কমূলক আলোচনায় (টক-শো) বোদ্ধা মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

ফুলের সৌরভে জীবন



বাগানে ফুটে আছে থোকা থোকা ফুল। নরম, সতেজ পাঁপড়ি। হৃদয়কাড়া সুবাস। কত সুন্দর এই ফুল। দেখলেই ভালো লাগে। মনটা খুশি হয়ে ওঠে। তাই না বন্ধুরা? এই পৃথিবীতে সেরা মানুষ যিনি- তোমরা নিশ্চয়ই জান, তাঁর কথা, তিনি ফুল ভালোবাসতেন- খুব ভালোবাসতেন। তিনি চেয়েছেন তোমরা সবাই, এ বিশ্বের সব মানুষ ফুলের মতো হবে।

বন্ধুরা! তোমরা কি জান, কিভাবে জীবনটাকে ফুলের মতো সাজানো যায়, কিভাবে ফুল হয়ে সংসার-বাগানে ফুটে থাকা যায়? না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ফুলের মতো সুবাসিত জীবন গড়ে তোলা সহজ– খুবই সহজ। এই সহজের একটা পথ আছে – সরল পথ। এই পথটা একবার যদি জেনে নিতে পারো এবং সেই পথে – সেই সরল সোজা, মসৃণ আলো হাওয়ায় ভরা পথে চলতে থাকো, তাহলে দেখবে জীবনের একেকটা পাঁপড়ি দল মেলতে থাকবে। এক সময় নিটোল ফুল হয়ে ওঠবে, চারদিকে সুবাস বিলাতে থাকবে।

জীবনটাকে ফুলের মতো ফুটিয়ে তোলা বা সাজিয়ে তোলা যে কত সহজ, কতো আনন্দের– তা তোমরা জানবে 'সকালের মিষ্টি রোদ'-এ, জীবন সাজাতে হাদীসের শিক্ষাসম্বলিত একগুচ্ছ গল্পে।

শরীফ মুহাম্মদ ভাইয়া তোমাদের খুব- খুউব ভালোবাসেন। তিনি তোমাদের জন্য, তোমাদের মনের মতো করে সাজিয়েছেন গল্পগুলো। দেখবে গল্প পাঠ শেষ করেই তোমরা আনন্দে চিৎকার দিয়ে ওঠবে–বাহ্! এইতো শিখে গেছি, জীবনটাকে কী করে কেমন করে সাজাতে হয় ফুলের মতো!

ইউসুফ শরীফ
শক্তিমান কথাসাহিত্যিক, প্রবীণ সাংবাদিক

ISBN : 435-968-19890-7-3

MAKTABATUL AZHAR

মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪০৭৬৩৬৫

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং-১ আন্ডার গ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭১৫০২৩১১৮

maktabatulazhar@yahoo.com